দেবসুন্দরী।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু

প্রণীত।

কলিকাতা; সাহিত্য যন্ত্র।

২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩০৪।

মূল্য ৷৷৹ বার আনা।
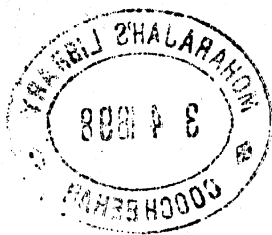
১৩/৭, বৃন্দাবন বসুর লেন; সাহিত্য যন্ত্রে
শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

নিবেদন।
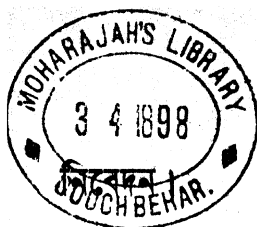
বঙ্গসাহিত্য সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে আর্য্যসাহিত্যের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়ে। কিন্তু শৈশব হইতে আমি ইংরাজী সাহিত্যেই শিক্ষিত হইয়া আসিয়াছি, সুতরাং আমার প্রবৃত্তি ও রুচি সেই শিক্ষানুসারেই সংগঠিত হইয়া আসিয়াছিল। সেই রুচি ও প্রবৃত্তি আর্য্যসাহিত্য-পাঠের তত অনুকূল ছিল না। ক্রমে আমি আর্য্য-সাহিত্যের প্রতি যতই অনুরাগী হইতে লাগিলাম, ততই দেখিতে পাইলাম, আর্য্যধর্ম্মের সহিত তাহার সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ যে, প্রকৃত-পক্ষে আর্য্যসাহিত্য বুঝিতে হইলে আর্য্যধর্ম্ম ভালরূপে বুঝা চাই। তাই, আর্য্যধর্ম্মানুসন্ধানে আমি প্রবৃত্ত হই। বাস্তবিক, আর্য্যধর্ম্ম আর্য্যধামে সর্ব্বব্যাপী, সেই ধর্ম্ম শুদ্ধ সাহিত্য কেন, আর্য্য আচার ব্যবহার ও সমাজকেও তাহা নিয়মিত করিয়াছে। যিনি আর্য্যধর্ম্ম না বুঝিয়া আর্য্যসমাজ বুঝিতে যাইবেন, তিনি তাহার গূঢ় নীতি কিছুই বুঝিতে পারিবেন না। সাহিত্য, সমাজেরই প্রতিবিম্ব; সুতরাং সাহিত্য বুঝিতে হইলে সমাজও বুঝিতে হয়; এবং সমাজ বুঝিতে হইলে ধর্ম্ম বুঝিতে হয়। ধর্ম্মজ্ঞান না থাকিলে রুচি ও প্রবৃত্তির ব্যভিচার ঘটে। সেই ব্যভিচারিণী প্রবৃত্তি ও রুচি লইয়া কোন সাহিত্যের গুণাগুণ সম্যক্ উপলব্ধি করা সুকঠিন। যাহাদের হিন্দু রুচি, তাহাদের নিকট ইংরাজী সাহিত্য বিস্বাদ বোধ হইবে, তদ্রূপ হিন্দু রুচি অনুসারে ইংরাজী সাহিত্য কিরূপ প্রতীত হয়, তাহা "সাহিত্যচিন্তায়" প্রদর্শিত হইয়াছে।

হিন্দুধর্ম্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া আমি পৌরাণিক সাহিত্য দেখিতে আরম্ভ করি। পৌরাণিক সাহিত্য আমার বড়ই মধুর লাগে। তাহাতে নবরস বিরাজিত; বাল্মীকি, ব্যাস ও অপরাপর হিন্দু ঋষিগণের কবিত্বে তাহা পরিপূর্ণ। সেই কবিত্ব ও কল্পনা বেদের সমুদায় সূক্ষ্মতত্ত্ব স্থূল অবয়বে আনিয়া তাহা জাজ্বল্যমান করিয়া দেখাইয়াছে, দেব ও ঋষিচরিত্র আঁকিয়াছে, এবং নানা আদর্শচরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছে। কিরূপ আদর্শচরিত্রের সৃষ্টিতে ঋষিগণের কবিত্বের পরিচয় হইয়াছে, তাহার কতিপয় চিত্র আমি "সাহিত্যচিন্তায়" প্রদর্শন করিয়াছি; পৌরাণিক দেবতত্ত্বে যে কবিত্ব, দর্শন, এবং সূক্ষ্ম বৈদিকতত্ত্ব নিহিত আছে, এই গ্রন্থে তাহারই কথঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়াই অভিপ্রেত। এই উদ্দেশ্যে যে সমস্ত দেবচিন্তা আমার মনে উদিত হইয়াছে, আমি সেই চিন্তারই অনুধাবন করিয়াছি। সেই দেবচিন্তায় যাহাতে ভ্রম না ঘটে, তজ্জন্য আমি শাস্ত্রালোক দেখিয়া শাস্ত্র-পথেরই অনুগামী হইয়াছি। তাই, গ্রন্থমধ্যে অনেক স্থলে শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে।

আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্রে ব্যাসের ক্ষমতা অতি অদ্ভুত। সেই ক্ষমতা-প্রভাবে তিনি চারিটি অদ্ভুত কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। আর্য্য-ঋষিগণ বেদের স্মারক এবং পুরাণের সৃষ্টিকর্ত্তা; ব্যাস সেই ঋষিগণের সৃষ্টিসকলের বিভাগ করিয়া এক এক খানি পুরাণ প্রস্তুত করিয়াছেন, এবং বৈদিক মন্ত্র সকলকে কর্ম্ম ও জ্ঞান-কাণ্ডানুসারে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন। এই বিভাগ-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াই ব্যাস নিরস্ত হন নাই। তৎপরে তিনি বেদান্তসূত্রের সৃষ্টি করিয়া বেদকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং মহাভারতের বৃহৎ

কল্পনার বিন্যাস করিয়া যে ভক্তি-শাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন, ভগবদ্গীতায় তাহার মূলতত্ত্ব সকলের খ্যাপন করিয়া ভগবদ্বাক্যে তাহার সমর্থন করিয়াছেন। জৈমিনি অধ্যাত্ম-রামায়ণে, বাল্মীকি-সৃষ্টির নিগূঢ় বৈদিক রহস্যের খ্যাপন করিয়াছেন। সেই ব্যাস, বাল্মীকি, জৈমিনি প্রভৃতি ঋষিগণের পদানুসরণ করিয়া আমি এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছি।

শ্রুতিতে লিখিত হইয়াছে, সীতাদেবী প্রকৃতিশক্তি। প্রকৃতি সৃষ্টি, স্থিতি, লয়কারিণী। সৃষ্টি-অগ্নি হইতে লয় হয়, এবং শৈত্য বা সোম হইতে সৃষ্টি ও স্থিতি হয়। শৈত্য অগ্নিরই স্বল্পতা মাত্র। সুতরাং এক অগ্নি দেবতাই সৃষ্টির মূল। সীতা সেই অগ্নি-আত্মিকা। পুরাণ লিখিলেন, দশানন স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই সীতার আত্মা অগ্নিতেই প্রবেশ করিয়াছিল; দশানন কেবল মায়াসীতার দেহমাত্র স্পর্শ করিতে পারিয়াছিলেন। পুরাণ এইরূপে সীতার পবিত্রতা রক্ষা করিলেন, অথচ শ্রুতির সূক্ষ্মতত্ত্ব বজায় রাখিলেন। যখন সীতার উদ্ধারসাধন হইল, তখন রামের নিকট সীতা আনীতা হইলে রাম দেখিলেন, এ যে মায়াসীতা; তাই তিনি লোকসমাজের তৃপ্ত্যর্থ সীতার অগ্নি-পরীক্ষার ব্যবস্থা করিলেন; কারণ, অগ্নি পরীক্ষার ব্যবস্থা করিলে একদা সমাজ সন্তুষ্ট এবং সীতার দেহে তাহার অগ্নি-আত্মা সঞ্চারিত হইবে। এদিকে অগ্নি-পরীক্ষারূপ এক অদ্ভুত কাণ্ডের সৃষ্টি করিলে সীতার দেবত্বও প্রতিপাদিত হইবে। সুতরাং লোকের ভক্তি পরিতৃপ্ত হইবে। পুরাণ এইরূপ অদ্ভুত কৌশলে সকল দিক বজায় রাখিলেন। আমি এই পৌরাণিক নিগূঢ় রহস্যের অনুসরণ করিয়াই বলিয়াছি, অগ্নি-পরীক্ষায় প্রলয়কারিণী সীতার আত্মা অগ্নিতেই

মিশিয়াছিল। সুতরাং আমি শ্রুতিরই অনুসরণ করিয়া দেব-চিন্তার প্রসার করিয়াছি মাত্র।

একই শ্রুতি অবলম্বন করিয়া পৌরাণিকেরা এইরূপ এক বিষয়ের বিভিন্ন বৃত্তান্ত দিয়া গিয়াছেন। তাই, জৈমিনি ও বাল্মীকির বিভিন্নতা। বৃত্তান্ত বিভিন্ন না হইলে স্বতন্ত্র পুরাণ হইবে কেন? বৃত্তান্ত বিভিন্ন হউক, সকলই শ্রুতিরই সম্প্রসারণ ও আলোক স্বরূপ। একই বস্তু বিভিন্নরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে মাত্র। যিনি শ্রুতির নিগূঢ় রহস্যের প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিবেন, তিনি নানাবিধ পৌরাণিক বৃত্তান্ত মধ্যে একই বস্তু দেখিতে পাইবেন।

যে যে অধিকারীর নিমিত্ত পুরাণ সৃষ্ট, তাহাদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যাহাদের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা অত্যন্ত প্রবল, তাহারা স্থূল অবতারবাদ সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিয়া লইতে পারেন। এই প্রকার জনগণের ভক্তিবৃদ্ধি করিয়া তাহাদিগকে সাত্বিক পথে আনিবার জন্য পৌরাণিক দেবদেবীর বিশাল সৃষ্টি। তাহাদের নিকট পুরাণের স্থূল বিবরণই যথেষ্ট। তাহারা কোন ব্যাখ্যা চাহে না। এই প্রকার অধিকারীর লোক সমাজমধ্যে অসংখ্য, তন্মধ্যেই স্ত্রীজাতি এবং সাধারণ অকৃতবিদ্য লোকারণ্য ধর্ত্তব্য। কিন্তু তাহাদের উপরে আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা পৌরাণিক স্থূল অবয়বে সন্তুষ্ট নহেন, তাঁহারা সেই স্থূল অবয়ব ভেদ করিয়া তাহার সূক্ষ্মতত্বে যাইতে চাহেন। তাঁহাদিগেরও প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য পুরাণ-কারগণ পুরাণমধ্যেই সেই সকল সূক্ষ্মতত্ত্ব স্থানে স্থানে দিয়া গিয়াছেন। যাঁহার বুদ্ধি আছে, তিনি সেই তত্বের রহস্যোদ্ভেদ

করিতে পারেন। নীলকণ্ঠ, গণেশ প্রভৃতি পৌরাণিক টীকাকার-গণও এই রহস্যোদ্ভেদে ব্যাপৃত হইয়াছেন। তাই, আমরা দেখিতে পাই, শাস্ত্রমধ্যেই সমুদায় আধ্যাত্মিক ব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে। শাস্ত্রকারগণ যদি পৌরাণিক তত্ত্বের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা না দিয়া যাইতেন, তবে তোমার আমার কথা কে গ্রহণ করিবে? এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সকলও শাস্ত্র-সম্মত। শাস্ত্র-সম্মত কি? শ্রুতি-সম্মত। কিন্তু তাহাদের অধিকারী বিভিন্ন। এই অধিকারিগণের নিমিত্ত "দেবসুন্দরী" প্রণীত। এই অধিকারিগণের জন্য যাহা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা অন্য অধিকারিগণের অপ্রীতিকর হইতে পারে, কিন্তু তৎসম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইল যে, যাহারা কোন প্রকার ব্যাখ্যা চাহে না, তাহাদিগকে কেই বা কোন্ কথা বলিতে যাইতেছে। এরূপ ব্যাখ্যা তাহাদের পক্ষে যে একান্ত অনাবশ্যক, এমত কথা বলিতে পারি না; তাহা হইলে পুরাণ ও তন্ত্রমধ্যে তাহা থাকিবে কেন? আমাদের প্রসিদ্ধ কথকেরা স্থানে স্থানে অতি মিষ্ট করিয়া সেরূপ ব্যাখ্যা দেন কেন? তদ্দ্বারাও নিম্নাধিকারিগণের ভক্তিবৃদ্ধি হইয়া থাকে। তাহাদের প্রবল শ্রদ্ধা এবং প্রগাঢ় বিশ্বাস অতি বাঞ্ছনীয় বস্তু। তাহারা সেই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা-প্রভাবে পুরাণের স্থূল বিবরণ অব-লম্বন করিয়া যেমন দেবপথে অগ্রসর হইতে পারে, তাহা সকল লোকেরই প্রার্থনীয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ যাহাদের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা তত প্রগাঢ় নহে, যাহাদের জ্ঞানবৃত্তি অধিকতর তেজস্বিনী, পুরাণকারগণ তাহাদিগের জ্ঞানপিপাসা কি অপরিতৃপ্ত রাখিয়া-ছেন? সেই জ্ঞানপিপাসা পরিতৃপ্ত করিয়া তাহাদের শ্রদ্ধা ভক্তির উন্মেষ করাও পৌরাণিক ঋষিগণের সাধু অভিপ্রায় ছিল। এই

সদ্ভক্তিপ্রায়ে প্রচালিত হইয়া তাঁহারা সেই দ্বিবিধ অধিকারিগণের উপযুক্ত সামগ্রী নিজ নিজ সৃষ্টি-ব্যাপার মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া গিয়াছেন। শুদ্ধ বিবরণ মাত্র এক শ্রেণীর যথেষ্ট, অপর শ্রেণীর নিমিত্ত সূক্ষ্ম দেবতত্ত্বের সমাবেশ।

"সাহিত্যচিন্তায়" আমি "সাহিত্যে দেবত্ব" নামক যে প্রস্তাব লিখিয়াছি, "দেবসুন্দরী" তাহারই পরিশিষ্টরূপে গৃহীত হইতে পারে। "সাহিত্যচিন্তা" পুরাণের এক দেশ দেখাইয়াছে, "দেবসুন্দরী" অন্য দেশের ব্যাখ্যা। সুতরাং "দেবসুন্দরী"ও সাহিত্য-সমালোচনার একাঙ্গ মাত্র। আর্য্যভক্তিশাস্ত্রের আর এক বিভা—"দেবসুন্দরী।"

এই গ্রন্থের সমস্ত প্রস্তাবই খণ্ডাকারে পূর্ব্বে "নবজীবন" প্রভৃতি মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই প্রবন্ধগুলিকে পরিবর্ত্তিত এবং পরিবর্দ্ধিত করিয়া এই গ্রন্থ-নিবদ্ধ করা হইয়াছে। "সাহিত্যচিন্তার" নিবেদন স্থলে যেমন বলিয়াছি, এখানেও তেমনি আবার বলি, সাহিত্যসম্পাদক শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্র সমাজপতির বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রমে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আমি আবদ্ধ রহিলাম।

কলিকাতা। হোগলকুঁড়িয়া।
১লা বৈশাখ ১৩০৪ সাল। } গ্রন্থকার

সূচীপত্র।

বিষয় | পত্রাঙ্ক।

দেব-সুন্দরী।

বঙ্গে দেবপূজা।

দেবভক্তি।

কবি গাইয়া গিয়াছেন :—

"এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গভরা।"

বাস্তবিক, বঙ্গদেশের মত রঙ্গভরা দেশ আমরা কুত্রাপি দেখি নাই। অযোধ্যা, পঞ্জাব, সিন্ধু, কি বোম্বাই; কলিঙ্গ, দক্ষিণ, মহারাষ্ট্র কি মান্দ্রাজ, বঙ্গদেশের মত পূজাপার্ব্বণ, ক্রিয়াকাণ্ডের ধূমধামে পূর্ণ কোন দেশ দেখি নাই। এখানকার সমাজে দিবারাত্র, দিন দিন, মাসে মাসে, বৎসরে বৎসরে কেবলই পূজা-পার্ব্বণ, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, বার-ব্রত চলিতেছে। সামাজিক উৎসব, পারিবারিক উৎসব ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে দেশ অনুদিন আনন্দে পরিপূর্ণ আছে। আজি দুর্গোৎসবে দেশ মাতিয়াছে, কালি রাস, পরশ্ব সরস্বতীপূজা; আজি পৌষপার্ব্বণ, কালি জামাইষষ্ঠী, পরশ্ব ভ্রাতৃদ্বিতীয়া; এ সমস্ত উৎসব-ব্যাপারই সামাজিক ও পারিবারিক উৎসব। আবার দেখ, গৃহলক্ষ্মী, গৃহের কোণে বসিয়া শুদ্ধাচারে ঐকান্তিক ভক্তিতে ব্রতের আয়োজনে ব্যস্ত আছেন; ব্রতের দিন সংযতচিত্তে—উপবাসে মুখ শুষ্ক বটে কিন্তু ধর্ম্মামোদে প্রফুল্ল হইয়া পূজার জন্য ধূপদীপ

জ্বালিয়া দিতেছেন। পূজা হইতেছে, তিনি ভক্তির মনে ধর্ম্মানন্দে পুরোহিত-পার্শ্বে বসিয়া সমুদায় শুনিতেছেন ও দেখিতেছেন; তত একাগ্রচিত্ত আর বুঝি কাহাকেও দেখি নাই। এ সমস্ত ইংরাজী চর্চ্চের শুষ্ক ব্যাপার নহে; মসিদের ফাঁকা আওয়াজ নহে। ব্রহ্মচর্য্যায় পরিশুদ্ধ হইয়া একান্ত ভক্তিসহকারে হিন্দু দেবোপাসনায় অনুরক্ত। এই আমোদে দেশশুদ্ধ প্লাবিত ও উন্মত্ত।

রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব।

হিন্দুর জীবন সূতিকাগার হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠানে পরিপূর্ণ। মৃত্যুর পরও তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। তাহার পূজা নির্জ্জনে ও নিভৃত গৃহমধ্যে। তিনি ধ্যানস্থ হইয়া নিজ অন্তরে দেবতাকে দেখেন, উপর দিকে শূন্য আকাশের পানে চাহিয়া উপাসনা করেন না। তাঁহার দেবমন্দির চর্চ্চ্ ও মসিদের মত শূন্য নহে, তাহাতে দেবমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। এই দেবমূর্ত্তি সেই অনন্ত সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণ্ড-দেবেরই স্থূল প্রতিমা ব্যতীত আর কিছুই নহে। সেই ব্রহ্মাণ্ডদেব যে অনন্তশক্তিতে সাধকের মনে উদয় হন, তাহারই এক একটি কল্পনা-বিকাশ ও সাধনোপযোগী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া সেই অনন্ত ঈশ্বরকেই হিন্দু পূজা করেন। যে সচ্চিদানন্দের রূপ বিশ্ব, * তাহাই বাঙ্গালীর

* বেদান্ত বলেন, সৎ, চিৎ, আনন্দ—পরব্রহ্মের এই ত্রিবিধ স্বরূপ। তাঁহার সত্তাই বিশ্বের সত্তা; অন্তর্যামী পরমাত্মারূপে সর্ব্ব ঘটে (জৈবিক, ভৌতিক) বর্ত্তমান বলিয়া সর্ব্ব পদার্থই চৈতন্য-সম্পন্ন ব্রহ্ম-স্বভাবযুক্ত হইয়া স্ব স্ব বিশ-

শিবলিঙ্গ, দশভূজা, জগদ্ধাত্রী ও কালী। হরপার্ব্বতী পুরুষ-প্রকৃতির রূপ; বেদ ও গায়ত্রীর মূর্ত্তি সরস্বতী। আর আত্মার সহিত পরমাত্মার যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, যে সম্বন্ধ যোগ দ্বারা ক্রমশঃই ঘনিষ্ঠতর হইয়া আত্মার সহিত পরমাত্মার একেবারে সম্মিলন ঘটিয়া আত্মার মুক্তি-সাধন হয়, সে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ কেবল স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ ব্যতীত আর কিছুরই অনুরূপ হইতে পারে না। এজন্য যোগের সেই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, হিন্দুঋষি কৃষ্ণরাধার লীলায় প্রকাশ করিয়াছেন। পুরাণ (ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তাদি) বলিয়াছেন, রাধিকা প্রকৃতির পরম-তত্ত্ব, কৃষ্ণ পুরুষের রূপ; তাঁহাদের আসক্তিই কৃষ্ণরাধার প্রেম। আত্মা যখন সংসারের কুটিলতা ও মায়া হইতে পরিব্রাজিত হয়েন, তখন তাহার ব্রজভাব ঘটে। সেই ব্রজভাবে প্রকৃতি ব্রজেশ্বরী; ব্রজেশ্বরীর মিলন আনন্দধাম বৃন্দাবনে। যত দিন না জীবের সংসারবীজ সমস্ত বিনষ্ট হয়, তত দিন তাহার মুক্তি নাই। এই সংসারবীজ ও সাংসারিকতা নির্ব্বাণ করিবার জন্য কৃষ্ণবিরহ। প্রকৃতিপুরুষের ঘনিষ্ঠতাই জগৎসংসার, জগতেই পুরুষপ্রকৃতি ঘোর আসক্ত; তাহাদের বিচ্ছেদই মুক্তির সোপান। রাধার শত বৎসর বিচ্ছেদে—জীবাত্মার শত বৎসরের অনাসক্তিতে মুক্তিলাভ। শত বৎসরের পর রাধিকার সহিত কৃষ্ণের মিলন। মিলনে জীবাত্মার মোক্ষপদ। যোগের এই সমস্ত নিগূঢ় তত্ত্ব এক একটি করিয়া হিন্দু,

---

ব্যাপারে অনুরক্ত থাকিয়া আনন্দে অবস্থিত রহিয়াছে। কি ভৌতিক কি জৈবিক, সকল পদার্থই সেই এক ব্রহ্ম-শক্তির উপাদানে শক্তির সমষ্টিমাত্র। সেই শক্তিসমষ্টি স্বকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া আনন্দে রহিয়াছে। বেদান্তের প্রমাণ বেদান্ত-দর্শনেই দৃষ্ট হইবে।

অবয়বী কল্পনায় কৃষ্ণলীলায় মূর্ত্তিমান করিয়া দেখাইয়াছেন। যোগে জীবাত্মা পরমাত্ম-তত্ত্বের সহিত যত ভাবে রমণ করেন, তাহার অনুভব ও মিলনের যত প্রকার স্তর অথবা পারমার্থিক অবস্থা আছে, তৎসমুদয় কৃষ্ণলীলায় প্রকটিত। কৃষ্ণ যখন মথুরায়, তখন তিনি প্রকৃতিতে অনাসক্ত হইয়া—বিষ্ণুশক্তিতে পৃথিবীর উদ্ধারসাধন করিতেছেন—মহাযোগী জগতের হিতব্রতে ব্রতী। দ্বারকা-লীলায়ও সেই ব্রত। রুক্মিণীর উদ্বাহে ভক্তের উদ্ধারসাধন। যোগী ভিন্ন কে এ ভাব বুঝিবে? এ ভাব পিতা-পুত্রের, বা প্রভু-ভৃত্যের, বা রাজা-প্রজার দূর সম্বন্ধ নহে। প্রজাপালনরূপ গোপালনে (গো অর্থে প্রজা) কৃষ্ণ, সংসার-ধামরূপ গোষ্ঠে বিহার করেন। অপরাপর গোপালেরা (প্রজাপালক বা দেবতারা) সখ্যভাবে তাঁহার সহিত সেই গোষ্ঠে ক্রীড়া করেন। আনন্দধাম নন্দালয়ে পিতা পুত্রের সম্বন্ধে কৃষ্ণ দেখা দিয়াছেন। কিন্তু অপরাপর ধর্ম্মে যেরূপ পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ, এ সেরূপ সম্বন্ধ নহে। পিতামাতার প্রতি সন্তানের অনুরাগ তত প্রগাঢ় নহে, যত সন্তানের প্রতি মাতাপিতার অনুরাগ। বাৎসল্য, বোধ হয় ভক্তি অপেক্ষা প্রগাঢ়তর। হিন্দুর ঈশ্বরানুরাগ, বাৎসল্য অপেক্ষাও বোধ হয় অধিক। যশোদা ও নন্দের বাৎসল্য একদা হিন্দুর দেবানুরাগের সহিত তুলনীয় হইতে পারে। সেইরূপ অনুরাগে হিন্দুরা দেবার্চ্চনা করিয়া থাকেন। হিন্দুরা দেবতাকে ক্ষীর ননী খাওয়ান। হৃদয়ের উৎকৃষ্ট উপহার (ভক্তি) পুষ্প-চন্দনে চর্চ্চিত করিয়া বিতরণ করেন। এ ভাবকে শ্রদ্ধা বলিলে যেন কিছু দূর দূর বুঝায়। তবে বল বাৎসল্য; শুধু বাৎসল্য নহে,—যশোদা ও নন্দের স্নেহানুরাগ—যে স্নেহ

শত রজ্জুতে কৃষ্ণকে বাঁধিতে চাহে। কিন্তু সে স্নেহ অপেক্ষা বুঝি আরও কিছু উৎকৃষ্ট জিনিষ আছে। যদি আর কিছু উৎকৃষ্ট জিনিষ থাকে, সে দ্রব্য রাধিকার কৃষ্ণানুরাগ। হিন্দুর দেবানুরাগ ক্রমশঃ স্ফুরিত হইয়া বাৎসল্য-ভাব অপেক্ষাও প্রগাঢ়তর হইয়াছে; প্রগাঢ়তর হইয়া রাধার প্রেমে উপনীত হইয়াছে। কৃষ্ণ আরও ঘনিষ্ঠতর হইয়া আসিয়াছেন। আসিয়া পতি-পত্নীর সম্বন্ধে মিলিত। কিন্তু ঠিক্ পতি-পত্নীর সম্বন্ধেও একটু যেন দূর-ভাব আছে। পত্নী, পতিকে খুব নিকট দেখেন বটে, অথচ যেন একটু উচ্চ উচ্চ প্রভুভাবে দেখেন। কেবল যে ললনা লুকাইয়া পতি-অনুরাগিণী হন, তাঁহার প্রেমে সে প্রভুতার দূরভাব নাই। রুক্মিণীর প্রেম সেইরূপ প্রেম, আর রাধার প্রেম সেইরূপ প্রেম। সেই গোপনীয় প্রেমে রাধা, কৃষ্ণকে ভালবাসিতেন। তাঁহার সহিত ক্ষণিক মিলনের জন্য লালায়িত হইতেন। মিলন হইলে আনন্দসাগরে ভাসিতেন। যেমন বিষয়ী, অর্থের জন্য লালায়িত; যেমন যোগী ঈশ্বরের জন্য লালায়িত; সেইরূপ লালায়িত রাধিকা। ক্ষণিক মিলনে যেমন যোগীর আনন্দ, রাধিকার আনন্দ ততোধিক। রাধিকা এইরূপ অনুরাগে কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত ছিলেন। এ যোগ, পতি-পত্নীর যোগ অপেক্ষাও গাঢ়তর। এ প্রেম, স্ত্রীপুরুষের গোপনীয় ঘনিষ্ঠ অনুরাগ। এ অনুরাগ যোগীর অনুরাগ। যে অনুরাগ সংসার-মায়ার উপর বিজয়ী, সেই অনুরাগ রাধিকার অনুরাগ, সেই অনুরাগ হিন্দুযোগীর ঈশ্বরানুরাগ। সেই অনুরাগের ক্রম-স্ফূর্ত্তি যোগতত্ত্বে অনুভবনীয়। সেই ক্রম-স্ফূর্ত্তির বাহ্যবিকাশই কৃষ্ণলীলা। হিন্দু এই জন্য রাধিকা ও কৃষ্ণলীলায় উন্মত্ত হন—

নন্দ-বিদায় ও রাধার প্রেম দেখিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করেন—দেব-দোল ও রাসে মাতিয়া যান।

বৈষ্ণবী-ভক্তি।

ভারতের অন্যত্র হিন্দুর যে সমস্ত সাত্ত্বিকভাব প্রকটিত দেখা যায়, বঙ্গদেশে সেই ভাব সহস্র আকারে প্রকটিত। বাঙ্গালী ষষ্ঠী-মার্কণ্ডেয়েরও পূজা করেন। বঙ্গে সকল দেবতারই আদর। অনন্তদেব সর্ব্বরূপেই পূজিত। সকল দেবপূজার সম্মুখে শালগ্রাম-শিলায় অনন্তদেবতার নিদর্শন রক্ষিত হয়। অগ্রে অনন্তের পূজা, তবে অন্য দেবপূজা। অনন্তদেবের সাক্ষীভূত যেমন শালগ্রাম, তেমনই সমস্ত দেবতা। সমস্ত দেবতার পূজায় সেই অনন্তদেবই পূজিত হইয়া থাকেন। পূজিত হন, ষোড়শোপচারে। স্বয়ং ভগবান বলিয়াছেন, যিনি যে দেবতার পূজা করুন না কেন, সকলই আমার পূজা। বাঙ্গালী, দেবতাকে অষ্টালঙ্কারে ভূষিত করেন, সমস্ত উৎকৃষ্ট দ্রব্য উপহার দেন। যাহা কাহাকেও না দেওয়া হয়, অগ্রে তাহা দেবতাকে সমর্পিত হয়। দেব-প্রসাদী না হইলে নূতন সামগ্রী ব্যবহৃত হয় না। কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, দেবভক্তি উভয়েরই সমান। বৈষ্ণবও হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে পরিপূরিত। উভয়েই নব পট্ট-বস্ত্রে, পবিত্র-চিত্তে, ব্রহ্মচর্য্যব্রত ধারণ করিয়া, শুষ্কমুখে অথচ প্রফুল্ল হৃদয়ে দেব-সম্মুখে ভক্তির সহিত কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান। দেবতাকে শত-সুন্দররূপে একদৃষ্টিতে দেখেন। দেবপ্রসাদ-লাভার্থ কোটি কোটি স্তব-স্তুতি করেন। চিরব্রহ্মচারী বৈষ্ণবদিগের দেবানুরাগ বুঝি আরও প্রগাঢ়তর। তাঁহারা রাধার প্রেমাদর্শে নিজ হৃদয়কে ভক্তিপূর্ণ করিতে

চাহেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্ত ততই লালায়িত হইতে চাহেন। তাঁহারা রাধার প্রেমাদর্শে উন্মত্ত, সেই প্রেমে গদ্গদচিত্ত। ভক্তের অনুরাগে রাধাকে ভালবাসেন। রাধাকে ভালবাসেন এইজন্ত যে, তিনি সমভাবে কৃষ্ণের জন্ত লালায়িত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণপ্রেমে তিনি দেবতা। তিনি মানবপ্রকৃতির পরমেশ্বরী। সেই রাধা, বৈষ্ণবদিগের জপমালা। রাধা জপমালা নয়, তাঁহার অমানুষ দেবতুল্য প্রেমই জপমালা। কৃষ্ণের প্রতি তাকাইয়া তাঁহারা রাধার প্রেমে একদা অশ্রুবর্ষণ করেন। সেই প্রেমাশ্রুর তুল্য আর বুঝি কিছু পৃথিবীতে নাই। সেই প্রেমে বৈষ্ণ-বেরা সদানন্দচিত্ত ও সংসারবিরাগী—সংসারের সকল সুখ বিস-র্জ্জন দিয়াছেন; বিসর্জ্জন দিয়া সমস্ত জীবনকে কৃষ্ণপ্রেমে উৎসর্গ করিয়াছেন। এ কি মনুষ্যজীবন? দেবজীবন—নারদের দেবর্ষি-জীবন! এ কি ভক্তি! দেবতার অনুরাগ—ভাগবতের দুর্ল্লভ বিষয়। ভাগবত দেদীপ্যমান—সশরীরে দেদীপ্যমান! বাস্তবিক বৈষ্ণবদিগের ভক্তি দেখিলে আনন্দ জন্মে। তাঁহাদের সংকীর্ত্তনে বঙ্গদেশ অহরহ প্রতিধ্বনিত হইতেছে, জয়দেবের সুন্দর ললিত পদাবলীতে উচ্ছ্বসিত হইতেছে। তাঁহারা দিবারাত্র হরিনামামৃত পান করিয়া কালাতিপাত করেন। কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, কি শৈব, সকলেই সামাজিক ধর্ম্মোৎসবে সর্ব্বদা দেশকে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন।

বঙ্গে দেবসুন্দরী।

ভারতের অন্তত্র এরূপ ঘটে নাই কেন? পুরাণের অধিকারী তো সবাই, আর এই পুরাণমধ্যে তো অনেক দেবতার কল্পনা

আছে। শাস্ত্রে তাঁহাদের পূজার পদ্ধতিও দেওয়া হইয়াছে; তবে ভারতের অন্যান্য দেশে বাঙ্গালার ন্যায় পূজার বাড়াবাড়ি ও ধুমধাম নাই কেন? তাহার বিশেষ কারণ আছে। বঙ্গ-দেশের ভূমির মত অপর কোন দেশের ভূমি তত উর্ব্বরা নহে। এখানকার চাষীরা সহজে প্রভূত ধন-ধান্যের অধিকারী হয়। কিছুদিন পরিশ্রম করিয়া বৎসরের বাকি দিন বসিয়া খায়। শুদ্ধ বসিয়া কি করিবে? ধন হইলেই লোকের দেবোত্তর বাড়ে। সুতরাং দেবারাধনা, পূজা, বার-ব্রত ও পার্ব্বণাদির উৎসবে বাঙ্গালী সংবৎসর সুখস্বচ্ছন্দে অতিবাহিত করে। চাষীরা চাষ করে, ভদ্রজনগণ কৃষি কার্য্যের ফল লাভ করিয়া গৃহ পূর্ণ করিয়া ফেলে। গৃহ পূর্ণ রাখিয়া উৎসবাদিতে সংবৎসর উন্মত্ত থাকে। কি ভদ্র, কি ইতর, জনসমাজের সমস্ত হিন্দুই ধর্ম্মোৎসবে উন্মত্ত। পূজার আয়োজনে সবাই ব্যতিব্যস্ত। ধনীর বাড়ীতে পূজা; দরিদ্রও আপনার পূজার সামগ্রী আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। যাঁহার যেরূপ ক্ষমতা, ভক্তি-সহকারে তাহাই দেব-সমক্ষে সমর্পণ করিয়া তবে তৃপ্তিলাভ করেন। সন্ধ্যা আহ্নিক নহিলে হিন্দু জলগ্রহণ করেন না। প্রতিদিন এই কার্য্য ও অনুষ্ঠান। বঙ্গদেশের দেবপূজা, সামাজিক ধর্ম্মোৎসব, পূজার উন্মত্ততা এবং আনন্দের মত, বুঝি সে দেশে আর কিছু উৎকৃষ্টতর পদার্থ নাই। ধন-ধান্য-পূর্ণ বঙ্গদেশ ধর্ম্মোৎসবে পরিপূর্ণ। ধন-ধান্যপূর্ণ বঙ্গদেশ বিলাসিতার পূর্ণ নহে। সুখে, সমৃদ্ধিতে, আনন্দে—হিন্দু-বঙ্গ-সমাজ, হিন্দুর ধর্ম্মামোদে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। বঙ্গদেশের এ সামান্য গৌরবের বিষয় নহে।

বঙ্গে প্রতিমা-পূজা এক বিশেষ আকারে পরিস্ফুট হইয়াছে।

বঙ্গদেশ ধান্যপূর্ণ ও শস্যপ্রাচুর্য্যে সুশ্যামল। এই সুশ্যামল দেশ, সৌকুমার্য্য ও মধুরতায় পরিপূর্ণ। বসন্ত এখানে অতি সুমোহন বেশ ধারণ করে। তখন বঙ্গদেশের চারি দিক্ই মাধুরীময়। শরতের সুশ্যামকান্তি সৌন্দর্য্যে ক্রমশঃই মনোহর হইয়া উঠে। হেমন্তে শস্যক্ষেত্র হাসিতে থাকে। প্রাবৃট্‌কালে প্রবাহিণীর শোভা, নৈদাঘ দিনান্তের মনোমোহিনী মূর্ত্তি, এ সমস্তই সুন্দর ও রমণীয়। এই সুন্দর ও মাধুরীময় দেশে যে মানবজাতি থাকিবে, তাহাদের হৃদয় তেমনি গড়িয়া আসিবে। বঙ্গবাসিগণ সৌন্দর্য্য দেখিয়া প্রফুল্ল, মাধুরীতে চিরদিন বিমুগ্ধ। তাহাদের হৃদয় কে যেন সেই মাধূরী দিয়া কোমল করিয়া আনিয়াছে। বাঙ্গালীর হৃদয় সৌকুমার্য্যের আধার। কবির কমনীয় রসে বাঙ্গালী সুরসিক। অতি সুকুমার রসে সে হৃদয় চিরদিন আর্দ্র আছে। মানবের যত কোমলভাব বাঙ্গালীর হৃদয়কে একজন্য অধিকার করিয়া আছে। বাঙ্গালীর ভক্তিতে আমরা সেই সৌকুমার্য্যের অনুভব করি। বাঙ্গালীর দেবতা, দেবীর কোমলভাবে পরিপূর্ণ। ভগবতীর মোহিনী মূর্ত্তি, জগদ্ধাত্রীর সুশান্ত রমণীয় ভাব, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর সৌন্দর্য্য, শ্যামার আনন্দময়ী করাল কান্তি, বাঙ্গালী আরও রমণীয় বেশে সুসজ্জিত করেন। তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ, যশোদানন্দন—যশোদার স্নেহমাখা পুত্তলী। বাঙ্গালী রাধার প্রেমে উন্মত্ত। যশোদার স্নেহে গলিয়া কৃষ্ণকে দেখেন। গোষ্ঠ ও মাথুর রসে কৃষ্ণ-প্রেমে ভাসেন। বৈষ্ণবের সুধাসঙ্গীত, কীর্ত্তনের মধুর তরঙ্গে প্রবাহিত। সেরূপ ধর্ম্মগীত ভারতের আর কুত্রাপি নাই। রামপ্রসাদের ভক্তিরসে শ্যামা ও কৃষ্ণ সুসংগীত। কবিওয়ালাদের গানে ভক্তি উৎসারিত। বৈষ্ণব-কবিগণের পদাবলীতে কৃষ্ণ-

রাধার প্রেমের লালিত্য। কথকের মনোমুগ্ধকর বাক্যস্রোতে ও রসাভাসে বাঙ্গালীর হৃদয় বিগলিত। আর পূজার চণ্ডীমণ্ডপে দেবীর মোহিনীমূর্ত্তি। তাঁহার মহাদেব উমাপতি—ভগবতীর বিরাটমূর্ত্তির শিরে ক্ষুদ্রাকারে চিত্রিত। দেবসেনাপতি মহাবীর কার্ত্তিকেয় অতি সুন্দররূপে কলাপীর পৃষ্ঠোপরি আরোহিত। মেনকার স্বপ্নে ও আগমনীর সঙ্গীতে ভগবতীর উদয়। রাসের সৌন্দর্য্যে কৃষ্ণরাধা শোভিত; দোলের প্রেমরাগে দোদুল্যমান। এইরূপ সুন্দর ও কোমলভাবে বাঙ্গালীর ভক্তিভাব প্রকটিত। বঙ্গদেশের দেবপূজা বঙ্গবাসিগণের সুকোমল হৃদয়ের সুন্দর পরিচয়।

ব্রহ্মবিদ্যার বর্ণমালা।

বঙ্গদেশের পূজা-পদ্ধতি ও ধর্ম্মামোদ কি পৌত্তলিকতা? সে কি খৃষ্টানদিগের নিন্দার সামগ্রী Idolatry (পৌত্তলিকতা)? যে ধর্ম্মোৎসব সমগ্র জনসমাজকে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা কি নিন্দার বিষয়? যে জিনিষ ধন-ধান্য-পূর্ণ, সুখ-সমৃদ্ধ বঙ্গসমাজকে বিলাসিতা হইতে রক্ষা করিয়া ধর্ম্মানন্দে পরিপূর্ণ করিয়াছে, সে কি রকম নিন্দার জিনিষ? ধর্ম্মামোদী হিন্দুসমাজ খৃষ্টানের কথায় ভুলিবার পাত্র নহে। খৃষ্টান মিশনরীগণ মহাভ্রান্ত। হিন্দুদিগের দেবদেবী Idolatry নহে, তাহা Symbollism। তাহা ঋষিদিগের ধ্যানজ রূপ-কল্পনা। সূক্ষ্মরূপ স্থূলে প্রকটিত। অনন্তদেব শতসহস্র বিভূতিতে প্রকাশিত। এই বিশ্ব যাঁহার নিত্যরূপ, তাঁহার রূপ-কল্পনায় বাধা কি? ঘটাকাশেও মহাকাশ বিদ্যমান। অজ্ঞজনগণের ব্রহ্মবিদ্যা-

লাভের জন্য এই প্রথম সোপান, তাহা ব্রহ্মবিদ্যার বর্ণমালা। এ যদি পৌত্তলিকতা হয়, তবে খৃষ্টানদিগের যীশুখৃষ্টের এবং মেরীর পূজা কি পৌত্তলিকতা নহে? প্রতিমা স্থূল হউক বা সূক্ষ্ম হউক, বাহ্য হউক বা মানসিক হউক, সে একই কথা। এই বর্ণমালা (Symbollism) অর্থাৎ দেবশক্তির নিদর্শনানুযায়ী স্থূল প্রতিমা-পূজার ব্যবস্থা হিন্দুধর্ম্মে প্রচলিত কেন? আমাদিগের প্রাচীন ঋষিগণ মানব সমাজকে বিলক্ষণ বুঝিতেন বলিয়া এই ব্যবস্থা। তাঁহারা বুঝিতেন, জনসমাজের সকল লোক, সমান নহে; সবাই সমান জ্ঞানী নহে। জ্ঞানভেদে দেবানুভব বিভিন্ন হয় এবং তজ্জন্য দেবানুরাগও বিভিন্ন হইয়া পড়ে। লোকের জ্ঞানাধিকার যখন সমান নহে, তখন জ্ঞানিদের জন্য যে ব্যবস্থা, অজ্ঞানিদের জন্য সে ব্যবস্থা করা বিড়ম্বনামাত্র। যাহাদিগের তর্ক করিবার শক্তি নাই, বিশ্বাসই যাহাদিগের প্রবল ও বিচারস্থানীয়, যাহারা কেবল সামান্য সাংসারিক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া চিরজীবন অতিবাহিত করে; শাস্ত্রালোচনা করিবার শক্তি, অবকাশ বা অধিকার যাহাদিগের নাই, সেই অসংখ্য, অগণ্য লোকসকলের দশা কি হইবে? অজ্ঞ শূদ্রজাতি, স্ত্রীজাতি, নীচবৃত্ত ও কলুষিত জনগণের সংখ্যাই জনসমাজে অধিক। এই সমস্ত লোকের জ্ঞানদ্বার যেমন অবরুদ্ধ, তাহাদের হৃদয় তেমনই প্রসারিত। সেই প্রসারিত ও প্রবল হৃদয়ের বিষয়ীভূত কি হইবে? সে হৃদয় তো শূন্য থাকিতে পারে না। যে হৃদয়ের পুত্রবাৎসল্য, মাতৃভক্তি, মমতা, মায়া দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়, সে হৃদয় কি ঈশ্বরশূন্য হইয়া কেবলই সংসারে আবদ্ধ থাকিবে? হৃদয়ই যাহাদের সর্ব্বস্ব, সেই হৃদয়-বিশিষ্ট

অসংখ্য জনগণের জন্য স্বতন্ত্র পূজাপদ্ধতি আবশ্যক। ব্যাস ভাবিয়া দেখিলেন, হিন্দুধর্ম্মে তো সে পূজাপদ্ধতির ব্যবস্থা বিলক্ষণ বিদ্যমান আছে। বেদে, উপনিষদে, দর্শনে দুই প্রকারই ব্যবস্থা আছে। জ্ঞানিদের জন্য নির্গুণ-বিদ্যা, অপরাপর জনগণের জন্য সগুণ-বিদ্যা। নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানে যাহারা অধিকারী নহে, তাহারা সগুণ ঈশ্বরোপাসনার অধিকারী। এই অধিকার লইয়াই হিন্দু-ধর্ম্ম গঠিত ও সম্পূর্ণ। অধিকার-তত্ত্ব হিন্দুধর্ম্মের একটি প্রধান লক্ষণ। বেদ, উপনিষৎ ও দর্শনে যে সগুণ ঈশ্বরোপাসনা পরিব্যক্ত আছে, তাহা আয়ত্ত করা সামান্য ও অজ্ঞ জনগণের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। যাহারা সে শাস্ত্রের অধিকারী নহে, যাহাদের বিশ্বাসই প্রবল, বিচারশক্তি অতি দুর্ব্বল, সেই সামান্য জনগণের জন্য বিশ্বাস-প্রধান কোন শাস্ত্র আবশ্যক। সেই শাস্ত্র পুরাণ,—পুরাণে ভগবান দেবদেবী রূপে অবতীর্ণ—অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর পাপভার মোচন ও ধর্ম্ম স্থাপন করিতেছেন। যে রূপে তিনি ভক্ত উপাসকগণের নিকট উদিত—যে রূপে তিনি ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন, সেই রূপে তাঁহার পূজা। যুক্তি চাও, দার্শনিকের কাছে চল ;—ন্যায় ও ব্রহ্মমীমাংসা দেখ। এ ব্যাপার কেবল ভক্তির সামগ্রী। এ ব্যাপার ভক্তিরসে সুন্দর, মনোহর, অতি উচ্চ, অতি ভয়ানক—দেবোচিত। এ ব্যাপার বুঝিতে চাও, ভক্তিরসে মনকে আর্দ্র কর,—ভক্তির অধিকারী হও। ভক্তি উদ্রেক করিবার জন্য প্রতিমাপূজা কর। *

---

* যুক্তিতে আপাততঃ বোধ হয় যে, এ ব্যাপারে সাধ্যসম দোষ ঘটে। তিনি ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য অবতীর্ণ, আবার, লোকের

প্রতিমা-পূজার অধিকারী। *

অধিকার-তত্ত্বানুযায়ী সমাজে সকল বিষয়েরই ব্যবস্থা আছে। সামান্য পাঠশালে ও বিদ্যালয়ে অধিকার অনুসারেই বালক-

---

ভক্তি উদ্রেকের জন্য তাঁহার রূপ-কল্পনা। যিনি ভক্তিতে লভ্য, তিনি আবার ভক্তি-উদ্রেকের সামগ্রী ; যিনি সাধ্য তিনিই সাধক ; একবার ভক্তির সাধ্য-ফল, আবার ভক্তির সাধক। কিন্তু অবতারবাদিগণ এ দোষ খণ্ডন করেন। তাঁহারা বলেন, ভগবানের রূপের সীমা নাই। ভক্তগণ, দেবতা-গণ ভক্তিপূর্ব্বক সেই অচ্যুত হরিকে ডাকিলে, জগতের ভার মোচনের জন্য কৃপা করিয়া তিনি সকল রূপই ধারণ করিতে পারেন। সর্ব্ব-শক্তিমান সকল শক্তিতেই উদয় হইতে পারেন। সেই ভার মোচনের জন্য তিনি যে রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সে রূপও তাঁহার একবিধ রূপ এবং শক্তি ও ঐশ্বর্য্যের পরিচয়। আমরা বিশ্বাস করি, তিনি বাস্তবিক সেই রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সুতরাং তাহা যদি ভগবানের রূপ হয়, সে রূপে তাঁহাকে উপাসনা করায় দোষ কি? ভগবান—সর্ব্ব ; যিনি সর্ব্ব, সর্ব্ব রূপেই তিনি উপাস্য। পৌরাণিকদিগের অবতারবাদ এইরূপ বিশ্বাসের উপর স্থাপিত। ঐতিহ্য প্রমাণই তাহাদের নিকট প্রবল। ঋষিবাক্যই সেই প্রমাণকে স্থাপন করে। আর্য্যধর্ম্মে রূপ ও নাম উভয়ই সঙ্কেত মাত্র। নাম রূপকে আনে, রূপ নামকে আনে। সর্ব্বদা রূপ ও নামের স্মরণেই দুরিত দূর হইয়া ঈশ্বরে প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে। যে যে রূপে ভগবান উদয় হইয়াছিলেন, সেই সেই রূপে যে শক্তি ও ঐশ্বর্য্যের পরিচয়, তাহারই ভাবনা, চিন্তা ও ধ্যানই ব্রহ্মবিদ্যা। তাই, প্রতিমার্চ্চনাদিকে ব্রহ্মবিদ্যার বর্ণমালা বলা হইয়াছে। শাস্ত্রে আছে—বেদবিদ্যা প্রথমতঃ দ্বিবিধ—মুক্তি-ফলার্থা এবং মোক্ষেতর-ফলার্থা। এই মোক্ষেতর-ফলার্থা বিদ্যা আবার দুই ভাগে বিভক্ত—ব্রহ্মবিদ্যা ও কর্ম্মবিদ্যা। এই ব্রহ্মবিদ্যা ক্রমশঃ মুক্তিফলার্থা বিদ্যার অধিকারে লইয়া যায়। তাহা কেবল নিম্নাধিকারী ঈশ্বরোপাসকের নিমিত্ত।

গণকে জ্ঞানশিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। লোকের খাদ্যাখাদ্য ও পথ্যাপথ্য অধিকার অনুসারেই নিয়মিত হয়। বিষয়কার্য্য অধিকার অনুযায়ী নির্দ্দিষ্ট। ব্যবসায়-বৃত্তিও অধিকার নিয়মে পালিত। সকল বিষয়ই যখন অধিকারভুক্ত, তখন কি কেবল ধর্ম্ম-প্রণালীই তাহা বর্জ্জিত হইবে? বরং ধর্ম্মপ্রণালীতে তাহা অধিকতর আবশ্যক। জনসমাজকে যখন পুণ্যপথের শাসনাধীন করিতে হইবে, সামান্য জনগণের হৃদয়কে যখন ভিজাইতে হইবে, তাহাদের পাপপ্রবৃত্তি সমুদয় যখন দমনে রাখিতে হইবে, যখন জনসমাজকে এক বিশেষ প্রকার শিক্ষাধীন করিয়া ধীরে ধীরে মোক্ষ ও শান্তিপথে আনিতে হইবে, তখন অধিকার অনুযায়ী শিক্ষাপ্রণালী ও তরিবদেরই তো অত্যন্ত প্রয়োজন। স্থূল হইতে সূক্ষ্ম তত্ত্বে লোককে একেবারে লইয়া যাওয়া যায় না। আমাদের দেশে বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঋষিগণ এ কথা বুঝিয়াছিলেন। বুঝিয়াছিলেন যে, সামান্য জনগণের নিকট স্থূল তত্ত্বই গ্রহণীয়। স্থূল প্রতিমার পূজা তাহাদের যত মনোজ্ঞ, সূক্ষ্ম মানসিক উপাসনা তত প্রীতিকর নহে। সূক্ষ্ম-তত্ত্ব তাহাদের মনে স্থান পায় না; তাহার ধারণা হয় না। সূক্ষ্মে উপনীত হইতে অনেক দেরি লাগে। সকলের বুদ্ধি তত দূর উচ্চ অধিকারশালিনী নহে। দেবমূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া লোককে ভয় দেখাইতে হইবে। নহিলে শূন্যদেবতায় সামান্য জনগণ তত ভয় পায় না। যে পাপকার্য্যে দেবকোপ, সেই দেবতা সম্মুখে দেদীপ্যমান চাই। সেই মূর্ত্তি ভয়ঙ্করও হওয়া চাই, অথচ তাহাতে দেবসৌন্দর্য্য এবং জ্যোতিও চাই। এ করাল কান্তি কালীর। এ সমস্ত উপায় নহিলে, সামান্য-জনগণ শাসিত হইবে না, তাহাদের দেবপূজা

হইতে পারে না। সেইজন্য ঋষিগণ বেদ, উপনিষৎ ও দর্শন হইতে সগুণ-বিস্তার মূলতত্ত্ব সকল গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা বিশ্বাসমূলীয় উপন্যাসাকারে কবিত্ব-পূর্ণ নানা পুরাণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কারণ, হৃদয়ই যাহাদের সর্ব্বস্ব, জ্ঞানপ্রধান নীরস কথা তাহাদের হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে না; সে হৃদয়ের আকর্ষণ শুধু সৌন্দর্য্যময় কাব্য। জনসমাজের উচ্চ অধিকারী জনগণের পক্ষে গীতার নিষ্কাম ভক্তিতত্ত্ব বিহিত হইতে পারে; আপামর সাধারণ জনগণের দশা কি হইবে? তাহারা যে নিম্ন-অধিকারী। জনসমাজে যে অগণ্য শ্রেণীর লোক বিদ্যমান। সেই নিম্ন-অধিকারী জনগণের জন্য সকাম ভক্তিতত্ত্বমূলক পূজা-পদ্ধতি।—মহাভারতে জ্ঞানাংশ এত অধিক যে, সামান্য জনগণের পক্ষে তাহা পঞ্চম বেদস্থানীয়। বিশ্বাসপ্রবণ, প্রবল-ভক্তি-পরায়ণ লোকের হৃদয় রামায়ণ ও ভারতের কল্পনা-সৃষ্টিপ্রভাবে নিশ্চয় আর্দ্র হইয়া যখন দেবপূজোন্মুখী হইবে, তখন সেই আর্দ্রচিত্ত কিসের উপাসনা করিবে? সেই উপাসনার জন্য বিবিধ পুরাণ, উপপুরাণ, ও তন্ত্রের সৃষ্টি হইল। তাহাতে ভক্তির উপাস্য প্রতিমা স্থাপিত হইল, এবং বিশ্বাসের পরিতোষসাধক অদ্ভুত ও বিস্ময়কর ঘটনা-সৃষ্টি কল্পিত হইল। উভয় উপকরণেই নিশ্চয় হৃদয় আকৃষ্ট হইবে। শিশুগণ পিতামহীর অদ্ভুত রূপকথা কত আগ্রহের সহিত শ্রবণ করে; স্ত্রীলোকেরা সেই গল্পই বা কেমন বিশ্বস্তচিত্তে গ্রহণ করিয়া থাকে। অদ্ভুত-রসই সামান্য জনগণের হৃদয় ভিজাইবার প্রধান উপায়। অদ্ভুত কথায় সামান্য জনগণ কোন সন্দেহ করে না; তাহাতেই তাহাদের সম্পূর্ণ আস্থা। তাহারা অনায়াসে, অকাতরে, আগ্রহের সহিত সে কথা শুনিয়া যায়, কোন দ্বিরুক্তি

করে না। অদ্ভুত কথা তাহাদের যেমন স্মরণ থাকে, এমন অন্য কোন কথা নয়। তাহারা সে কথা কখন ভুলিয়া যায় না। তাই পুরাণে সেই অনৈসর্গিক বর্ণনার ছড়াছড়ি। কারণ, অনৈসর্গিক ঘটনা-কল্পনায় ভক্তির বিরাট বিকাশ হয়। যখনই কোন দেব-ভাব বা কোন অলৌকিক ভক্তিভাব প্রকটিত করিতে হইবে, তখনই অনৈসর্গিক বর্ণনার অবতারণা আবশ্যক। সেইরূপ বর্ণনা আছে বলিয়া পুরাণোক্ত বিষয় সমুদয়, এত গম্ভীর ও লোকের মনে চিরকাল জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ণ সামান্য জনগণ তাহা অবিশ্বাস করে না।

প্রতিমা-তত্ত্ব।

এ জগৎ সৌন্দর্য্যের প্রতিমা। যে দিকে চাও, সৌন্দর্য্যের প্রতিমা তোমার নয়নসমক্ষে দেদীপ্যমান। চারি পার্শ্বে বৃক্ষলতা ও কুসুম তোমার দৃষ্টি পরিতৃপ্ত করিতেছে। বনবিহারী বিহঙ্গকুল, উড্ডীয়মান পতঙ্গকুল, জলচারী মৎস্যকুল, সকলই সৌন্দর্য্যের প্রতিমা। সামান্য কীট হইতে বৃহৎকায় মাতঙ্গ পর্য্যন্ত সৌন্দর্য্যের পরিচয় দিতেছে। পর্ব্বত, কানন, প্রান্তর, নদী প্রভৃতি সকলই সুন্দর ও মনোহর। আবার গগনে উর্দ্ধদৃষ্টি কর, দেখ চন্দ্র, সূর্য্য ও অসংখ্য নক্ষত্ররাজি রূপের প্রতিমায় উদ্ভাসিত আছে। অণু-বীক্ষণসহকারে পর্য্যবেক্ষণ কর, দেখিতে পাইবে, প্রতি জল-কণায়, প্রতি বৃক্ষপত্রে, প্রতি পুষ্পদলে, শত শত সুন্দর কীটাণু আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে তোমার দৃষ্টিপথে উদিত হই-তেছে। দূরবীক্ষণ দিয়া আবার নভোমণ্ডল অবলোকন কর,

দেখিতে পাইবে, কত বর্ণের কত স্থির নক্ষত্র তোমার চক্ষে জাজ্বল্যরূপে প্রতীয়মান হইতেছে,—যে নক্ষত্র সমুদায় হয় তো এক একটি বৃহৎ সূর্য্যমণ্ডল, যাহারা সূর্য্য অপেক্ষা কত সহস্রগুণে বৃহত্তর এবং যাহাদিগের দীপ্তি এখনও পৃথ্বীদেশ স্পর্শ করে নাই। এই সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বল, ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত, অনন্ত সৌন্দর্য্যের রূপ, রূপের প্রতিমা অনন্ত!

প্রতিমা দুইরূপে অনন্ত। অণুবীক্ষণ দিয়া যখন আমরা জগতের রূপ দেখি, তখন দেখি জগৎ অণিমায় অনন্ত। সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতর হইতে সূক্ষ্মতম প্রকৃতিরাজ্য অনন্ত সীমায় যে কোথায় মিলাইয়া যায়, অণুবীক্ষণেরও শক্তি নাই যে সে সীমার নির্দ্দেশ করে। সূক্ষ্মতম রূপপ্রতিমা পর্য্যন্ত তোমার অনুবীক্ষণের দৃষ্টিশক্তি। অনুবীক্ষণের শক্তি আরও বৃদ্ধি কর, আরও সূক্ষ্মতর রূপপ্রতিমা প্রতীয়মান হইবে। তবে আর এ অনন্তের সীমা কোথায়? পরমাণু এত সূক্ষ্ম হইতে পারে, যাহার বহু সমষ্টি তোমার আণুবীক্ষণিক সূক্ষ্মতম রূপপ্রতিমা। বহুসমষ্টি নহিলে জীব সঞ্জাত হয় না। বহুসমষ্টি নহিলে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হয় না। বহু সমষ্টি নহিলে সৌন্দর্য্যের প্রতিমা পরিপুষ্ট হয় না। যে সমস্ত পরমাণুতে আণুবীক্ষণিক সূক্ষ্মতম জীব সৃষ্ট, সে সমস্ত পরমাণু কত সূক্ষ্ম। সে সমস্ত পরমাণুর প্রতিমা কত সূক্ষ্ম। অতএব প্রতিমা অণিমায় অনন্ত। এই প্রতিমা আবার মহিমায় অনন্ত! দূরবীক্ষণ তাহার প্রমাণ; অনন্ত আকাশ তাহার দেদীপ্যমান সাক্ষী! যাহা অণিমা, লঘিমা ও মহিমায় অনন্ত, তাহা নারায়ণ। অতএব নারায়ণরূপী প্রতিমাকে নমস্কার।

এই নারায়ণের নাম পুরুষ। এই মূলতত্ত্ব তখন পুরুষত্ব

প্রাপ্ত হন, যখন তাহা গুণান্বিত হয়, যখন নারায়ণ সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়গুণে সমন্বিত হন, যখন নারায়ণ সত্ব, রজঃ ও তমোগুণে আক্রান্ত হন, তখন তিনি পুরুষ। পুরুষ যখন সত্ব, রজঃ ও তমোগুণে এরূপে পরিণত হন, যে তাহাতে একটি সৌন্দর্য্যের প্রতিমা গঠিত হইতে থাকে, তখন তিনি সুন্দরী প্রকৃতি। প্রকৃতি স্থিতিগুণে সমন্বিত হইয়া যখন সৌন্দর্য্যের প্রতিমায় প্রকটিত হন, তখন জগতের বিকাশ হয়। এই জগতের নাম স্থুল প্রকৃতি। সূক্ষ্ম প্রকৃতি তাহার সূক্ষ্ম গুণময় ভাব। সূক্ষ্ম প্রকৃতির আদি পুরুষ, পুরুষের নির্গুণ ভাব অনন্ত পরমাত্মা। প্রকৃতি ব্যতীত ব্রহ্ম থাকেন না এবং ব্রহ্ম ব্যতীত প্রকৃতি থাকেন না; উভয়েই একীভূত। যে সময় সত্ব, রজ ও তমোগুণ সমভাবে মিলিত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে পরাভব করে, কোন গুণেরই প্রাদুর্ভাব থাকে না, তখন সেই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাকেই মূল প্রকৃতি বলে; মূল প্রকৃতিতে কোন গুণের বিকাশ ও বিক্রম না থাকাতে, গুণ সকল পরস্পর অভিভূত ও লয় প্রাপ্ত হওয়াতে, এই পুরুষ সংযুক্ত মূল প্রকৃতিকে নির্গুণও বলা হইয়া থাকে। সেই প্রকৃতিতে যখন গুণের বিকাশ হয়, তখন তাহা অনন্ত কাল ও ব্রহ্মাণ্ড সত্তায় অব্যক্ত সূক্ষ্ম রূপে আসেন। পুরুষ সেই মহান্ অনন্তের পরমাত্মা। এই অনন্ত পরমাত্মা সর্ব্বজীব ও পদার্থের সারতত্ব। অথবা এই নির্গুণতত্ব অনন্ত প্রতিমায় পরিদৃশ্যমান ও অবস্থিত। এই প্রতিমা অনন্ত দেশে স্থিত, অনন্ত কালে স্থিত। পুরুষ, প্রকৃতি ও আত্মা কখন বিভিন্ন নহে। চিরকালই আত্মা বর্ত্তমান, চিরকালই তাহার রূপ বর্ত্তমান। রূপ ব্যতীত আত্মা বর্ত্তমান হইতে পারেন না। সুতরাং রূপই যখন

আত্মার বর্ত্তমানত্বের নিদানভূত, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে, জগৎরূপ প্রতিমা অনন্ত দেশে ও অনন্তকালে পরিব্যাপ্ত।

স্বষ্টির এই নিগূঢ় রহস্য আর্য্যঋষি যখন প্রতীত করিলেন, তখন তিনি মহোল্লাসে উন্মত্তপ্রায় হইয়া মনে তাহার ধারণা করিতে গেলেন। কেবল ধ্যানে এ রহস্যের অনুভব হয়। যে ধ্যানে এই রহস্য প্রতীত হইয়াছে, সেই ধ্যানে তাহাকে ধারণা করিয়া তাহা বাহ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। প্রতিমা ধ্যানজরূপ, সেই ধ্যানজ প্রতিমা অনন্তদেবের প্রতিমূর্ত্তি। যে গূঢ় তত্ত্ব বেদে জ্ঞানরূপে প্রতীত, পুরাণে তাহা প্রতিমায় প্রতিষ্ঠিত। পুরাণ বেদের স্থূল দেহ। জ্ঞান প্রতিমায় অঙ্কিত ও সজ্জিত হইয়া পুরাণে প্রকটিত হয়। সেই পৌরাণিক প্রতিমা অনন্তদেবের মূর্ত্তিতে স্বষ্টির প্রহেলিকা প্রকাশ করে। অনন্ত নাগ সহস্র ফণায় অনন্তের নিদর্শন। তন্মধ্যে অনন্তদেব শায়িত—অনন্ত কার্য্যকারণ-সাগরে শায়িত। যেহেতু, অনন্ত দেশে অনন্ত সত্ত্ব নিহিত আছেন। সেই সত্ত্বেই অনন্ত দেশ সত্ত্বাবান্। এই অনন্ত সত্ত্বই সর্ব্বগুণান্বিত, সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষ। সেই পুরুষ নারায়ণ-রূপে অনন্ত নাগের সহস্র ফণাসজ্জিত শয্যায় শায়িত। স্বষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণ এবং অহঙ্কার তত্ত্ব— এই চতুর্বিধ গুণ অনন্তদেবের চতুর্ভুজ। * যে জগৎ নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল ও ক্ষণভঙ্গুর, সেই জগৎ তমোময় ভুজে পদ্মরূপে অবস্থিত। জগতের কারণ রূপ মহামায়া গদারূপে অহঙ্কার ভুজে

---

* "সত্ত্বং রজস্তম ইতি অহঙ্কারশ্চতুর্ভুজঃ।
পঞ্চভূতাত্মকং শঙ্খং করে রজসি সংস্থিতম্॥"
গোপালতাপনীয়শ্রুতিঃ। উত্তর বিভাগ।

বর্ত্তমান রহিয়াছে। রজোগুণময় করে ব্রহ্মাণ্ডোপকরণ পঞ্চভূতের স্বরূপ শঙ্খ শোভমান। * সত্ত্বগুণাত্মকভুজে সৃষ্টিকাণ্ডের পরিপাকচক্র। ব্রহ্মাণ্ড এই চক্রে নিয়মিত হইয়া নারায়ণের কার্য্য সাধন করিতেছে। ঊর্দ্ধ ও অধোদেশ নারায়ণের পাদদ্বয়। যে তেজ চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি ও বাক্যের তেজোময় সত্ত্বা—সেই তেজ কৌস্তুভমণি। † এই তেজই তাপ; এই তাপ এবং তাপের প্রশমন শৈত্য পরমাণু-পুঞ্জের যোগাযোগের কারণ। স্থাবর ও জঙ্গম, এই দ্বিবিধ সৃষ্টি তাঁহার কুণ্ডলদ্বয়। যে বস্তু জগতে সৎস্বরূপ ও শ্রেষ্ঠ, কিরীট সেই সৎ পদার্থের নিদর্শন ও শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার। ‡ এই শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী সর্ব্বসম্পদবিজয়ী অনন্ত পুরুষের পাদমূলে ঐশ্বর্য্যশীলা লক্ষ্মীদেবী স্থাপিতা। যেহেতু, ঐশ্বর্য্যসমন্বিত না হইলে পুরুষ সৃষ্টির কারণ হইতে পারেন

---

* বালস্বরূপমত্যন্তং মনশ্চক্রং নিগদ্যতে।
আদ্যামায়াভবেচ্ছার্ঙ্গং পদ্মং বিশ্বং করে স্থিতম্॥
আদ্যাবিদ্যা গদা বেদ্যা সর্ব্বদা মে করে স্থিতা।
ধর্ম্মার্থকামকেয়ূরৈর্দিব্যৈর্দিব্যমহীরিতৈঃ॥
তাপনীয়শ্রুতিঃ।

বিষ্ণুপুরাণান্তর্গত ১ম অংশের ২২ অধ্যায়স্থ ৬৭ হইতে ৭০ শ্লোক পর্য্যন্ত দেখ।

† "যেন সূর্য্যাগ্নিবাক্চন্দ্রং তেজসা স্বস্বরূপিণা।
বর্ত্ততে কৌস্তুভাখ্যং হি মণিং বদন্তীশমানিনঃ॥"
তাপনীয়শ্রুতিঃ।

‡ "কূটস্থং সৎস্বরূপঞ্চ কিরীটং প্রবদন্তি মাং।
ক্ষরোত্তমং প্রস্ফুরন্তং কুণ্ডলং যুগলং স্মৃতং॥"
তাপনীয়শ্রুতিঃ।

না। পুরুষ, প্রকৃতিসংযুক্ত হইয়া সৃষ্টি করিতেছেন। সেই পুরুষের মধ্যদেশস্থ নাভিকুণ্ড হইতে ব্রহ্মাণ্ডরূপ সৃষ্টি-কমল সমুত্থিত। সেই সৃষ্টি-কমলে সৃষ্টিদেব ব্রহ্মার প্রতিমা। সৃষ্টি-দেব, নারায়ণতেজে অগ্নিময় বালার্ক রাগরঞ্জনে দেখা দিয়াছেন। * সাংখ্যকার বলেন—"রাগবিরাগয়োর্যোগঃ সৃষ্টিঃ।" ব্রহ্মা চারিদিকে চতুর্মুখে সৃষ্টি করিতেছেন। তাঁহার চারিদেশে চারি বাহু বিস্তৃত। যখন সৃষ্টি অহংজ্ঞানে সমন্বিত হয়, তখন তাহা জীবনামে প্রথিত। এই অহংজ্ঞানই মহামায়া ও মিথ্যাদৃষ্টি। এই অহংজ্ঞানই অহংকারতত্ত্ব। যখন জীবের অহংজ্ঞান হইল, তখন তাহা ব্যক্তিগত জীব হইয়া জীবনপ্রাপ্ত। ব্রহ্মার ত্রিভুজে ত্রয়ী বিদ্যার অভিজ্ঞানস্বরূপ ত্রিবেদ। কারণ, বেদের অর্থই জ্ঞান, এবং ব্রহ্মাই শব্দব্রহ্ম; শব্দব্রহ্মই বেদ; বেদই শব্দ। দর্শনে এ তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ব্রহ্মার চতুর্থ ভুজে জীবনীশক্তিদায়ক অমৃতভাণ্ড কমণ্ডলু। এই প্রতিমায় সৃষ্টির নিগূঢ় রহস্য প্রকাশ করিতেছে। এই প্রতিমা দেবপ্রতিমা, কারণ উহাতে সৃষ্টির অধিষ্ঠাত্রী দেবশক্তিরই বিকাশ হইয়াছে। যাহা বিশ্বের কর্তৃত্ব ও অধিষ্ঠাত্রী দেবশক্তির বিকাশ ও অভিজ্ঞান, তাহা অবশ্য পূজনীয়। এই জন্য দেবপ্রতিমা পূজার ভাজন হইয়াছেন। আমরা যখন এই প্রতিমাকে পূজা করি, তখন সেই অনন্তদেব ভিন্ন আর কাহারই

---

* "সর্ব্বং তুষ্ণাত্মকং কিঞ্চিত্তেজোঽর্কাগ্ন্যাভিধং বিদুঃ।
শীতাত্মকন্তু সোমাখ্যমাভ্যামেব কৃতং জগৎ॥"—যোগবাশিষ্ঠ।

"অগ্নিও সোম দ্বারা জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। উষ্ণাত্মক তেজকে অগ্নি এবং শীতাত্মক তেজকে সোম কহে।" এই সৃষ্টি-অগ্নি রজোগুণ (Energy) এবং শৈত্য তমোগুণান্বিত (Inertia) শৈত্য দ্বারা পরমাণু-পুঞ্জ সংযোজিত এবং অগ্নি দ্বারা বিয়োজিত। এ জন্য স্থূল সৃষ্টি তমোগুণান্বিত।

পূজা করি না—যে অনন্তদেব তমোগুণান্বিত হইয়া নীলাভ প্রতিমায় সৃষ্টির কারণ রূপ মহাসাগরে পরমাত্ম-রূপে শায়িত। আর্য্যঋষি সমস্ত প্রতিমাপূজায় এই অনন্ত দেবেরই পূজা করিয়া থাকেন। শালগ্রাম অনন্তদেবেরই নিদর্শন মাত্র, কারণ, শিলাতেও তিনি বর্ত্তমান। শিলা সর্ব্বাপেক্ষা বহুকালস্থায়ী বলিয়া তাহাই নিদর্শনরূপে গৃহীত হইয়াছে।

সৃষ্টির পর স্থিতি, স্থিতির পর লয়। পরিবর্ত্তনশীল জগতের নিয়ম এই। যাহা নিত্য পরিবর্ত্তনশীল, যাহা যায়, যাহা থাকে না, যাহা নিয়ত আবির্ভাব ও তিরোভাবময়, তাহাই জগৎ। ঋগ্বেদীয় পুরুষ সূক্তে আছে, সেই ত্রিবিক্রম অমৃতাত্মা এক পাদ দ্বারা ব্যক্ত হইতে অব্যক্তে ও অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত জগতে যাতায়াত করিতেছেন। ব্রহ্মাণ্ডের সমস্তই নিয়ত পরিবর্ত্তন হইতেছে, অথচ ব্রহ্মাণ্ড চিরকাল বর্ত্তমান। জগৎ প্রবাহ রূপে নিত্য এবং তন্নিহিত পরমাত্মন্ কূটস্থ নিত্য—ভগবান্ পতঞ্জলি এই দ্বিবিধ নিত্যের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহা চিরকাল বর্ত্তমান ও নিত্য, তাহাই জগতের পরম নিত্য বস্তু, যাহা নিয়তই পরিবর্ত্তন হইতেছে তাহাই মিথ্যা-দৃষ্টি ও মহামায়া। সমস্তই পরিবর্ত্তন হইতেছে বটে, কিন্তু সমস্তের মধ্যেই নিত্য বস্তু অবস্থান করিতেছেন; সমস্তই পুনঃ পুনঃ দেহ ও রূপ পরিবর্ত্তন করিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। জগতের এই ঘোর প্রহেলিকা। তুমি মনুষ্য—তুমি নিয়তই পরিবর্ত্তিত হইতেছ বটে, কিন্তু তোমার সমস্তই রহিয়াছে। তুমি শৈশবে যাহা ছিলে, যৌবনে তাহা নহ; আবার যৌবনে যাহা ছিলে, বার্দ্ধক্যে তাহা নহ। এমত কি, গত কল্য যাহা ছিলে, অদ্য তাহা নহ। গত কল্য কি, এক ঘণ্টা পূর্ব্বে যাহা ছিলে, এক ঘণ্টা পরে তাহা

নহ। তোমার শরীর মন নিয়তই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। যে তোমাকে এক দিন শৈশবে দেখিয়াছিল, আর দেখে নাই, যৌবনে তোমাকে অন্য একদিন সহসা সে দেখিলে, হয় ত চিনিতে পারিবে না। তোমার সমস্তই পরিবর্ত্তন হইয়াছে, অথচ তুমি অহংজ্ঞানে সেই তুমিই আছ। এই পরিবর্ত্তনে প্রতিনিয়ত তোমার শরীরে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের প্রক্রিয়া চলিতেছে। প্রতি-পলে তোমার দেহাভ্যন্তরে একদা সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হই-তেছে। * যাহার ধ্বংস হইতেছে, খাদ্য ও নিশ্বাস দ্বারা তাহার ক্ষতিপূরণ হইতেছে। ধ্বংস হইতেছে, তাহার ক্ষতিপূরণ হই-তেছে, অথচ তন্মধ্যে তুমি সজোরে বাঁচিয়া রহিয়াছ। প্রতিক্ষণে যেমন লয় হইতেছে, অমনি সৃষ্টি হইতেছে, অমনি বাঁচিয়া রহি-য়াছ। এইরূপে তোমার দেহের সংসার চলিতেছে। তোমার দেহের সংসার যেরূপে চলিতেছে, অপরাপর সর্ব্ব জীবের সংসার সেইরূপে চলিতেছে। জগতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর একত্র নিত্য বর্ত্তমান, নিত্যই স্ব স্ব কার্য্য করিতেছেন। কারণ, যাহা সঞ্জাত হইয়াছে, তাহা ত্রিগুণসমন্বিত হইয়া জন্মিয়াছে। যাহা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণে আশ্রিত হইয়া জন্মিয়াছে, তাহা চির-দিনই সেই ত্রিগুণের পরিচয় দিবে। অনন্তপুরুষ এই ত্রিগুণ-সমন্বিত হইয়া জগৎব্যাপ্ত রহিয়াছেন। † তাঁহার সৃষ্টিগুণ ব্রহ্মা,

---

* "সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তয়ঃ সর্ব্বদেহিষু।
বৈষ্ণব্যঃ পরিবর্ত্তন্তে মৈত্রেয়াহর্নিশং সদা॥
বিষ্ণুপুরাণ। ১ অংশ ৭ অধ্যায়।

† স্রষ্টা সৃজতি চাত্মানং বিষ্ণুঃ পাল্যশ্চ পাতি চ।
উপসংহ্রিয়তে চান্তে সংহর্ত্তা চ স্বয়ং প্রভুঃ॥
বিষ্ণুপুরাণ। ১ম অংশ ২য় অধ্যায়।

তাঁহার স্থিতিগুণ বিষ্ণু, এবং তাঁহার লয়গুণ মহেশ্বর। সাংখ্য-মতে লয় শব্দের অর্থ, কারণে লীন হওয়া; অত্যন্ত নাশ, অত্যন্ত অভাব; অত্যন্ত অভাব অচিন্তনীয় ও অসম্ভব। ব্রহ্মাণ্ডে এই ত্রিবিধ শক্তি নিত্য বর্ত্তমান। এক ব্রহ্মসত্তা হইতে সকলই সত্তাবান্। সুতরাং অত্যন্ত অভাব কোন কালেই ছিল না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও মহেশ্বর নিত্যদেবতা। এই তিন লইয়া সংসার, এই তিন লইয়া ব্রহ্মাণ্ড, অথচ এই তিনই এক অনন্তদেব। আর্য্যঋষি যখন এই অনন্ত দেবের ভাবনা করিয়াছেন, তখন তিনি তাঁহাকে এই ত্রিবিধ ভাবেই দেখিয়াছেন। বেদ ও পুরাণের আলোচ্য বিষয়, এই ত্রিবিধ দেবতা। এই ত্রিবিধ দেবতার প্রকৃতি-পরিচয় তাঁহাদের লীলা নামে পুরাণে প্রথিত হইয়াছে। এই ত্রিবিধ দেবতার প্রতিমা, পুরাণে প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তৎপরে তাঁহাদের কার্য্যের প্রতিমা লীলারূপে ব্যক্ত হইয়াছে। সেই লীলাগুলি দেবতাদিগের প্রকৃতি ও কার্য্যের প্রতিকায় এবং প্রতিমা মাত্র।

দর্শনাদির নিগূঢ়তত্ত্ব যখন পুরাণাকার ধারণ করিল, তখন তাহা গল্পের ছাঁদে ইতিহাসরূপে বর্ণিত হইল। ব্রহ্মাণ্ডপতির যে সমস্ত শক্তির নিদর্শন সূক্ষ্মরূপে ব্রহ্মাণ্ডময় ব্যক্ত আছে, সেই সমস্ত শক্তি * শ্রেণীবদ্ধ হইয়া মূর্ত্তিমতী হইয়াছে। অনন্তদেব জগতে প্রথমে ত্রিবিধ প্রধান শক্তির পরিচয় দিতেছেন। সেই ত্রিবিধ

---

* ভগবান্ শঙ্কর তাঁহার শারীরক ভাষ্যে শক্তির এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন:—

"কারণস্যাত্মভূতা শক্তিঃ শক্তেশ্চাত্মভূতং কার্য্যং।"

"যাহা কারণের আত্মভূত তাহাই শক্তি; শক্তিরই আত্মভূত কার্য্য।" সুতরাং এই জগৎরূপ কার্য্য শক্তিরই স্থূল কায়া।

শক্তি—সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়। এজন্য আদিতে তিনি ব্রহ্মামূর্ত্তিতে সৃষ্টি করিলেন; সৃষ্টি করিয়া যে শক্তিতে পালন করিতেছেন, তাহা সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু; আর যে শক্তি-প্রভাবে জগতের সংহার-কার্য্য চলিতেছে, সেই শক্তি মহেশ্বর। এই ত্রিবিধ শক্তি, অনন্তকালই কার্য্য করিতেছে এবং অনন্তকালই বর্ত্তমান আছে। শুদ্ধ তাহাই নহে, তাহারা অভিন্ন হইয়াও জগতে কার্য্য করিতেছে, কিন্তু তাহাদের কার্য্যের পরিচয় মানবের স্থূল মানস-দৃষ্টিতে স্বতন্ত্ররূপে প্রতীত হয় বলিয়া তাহারা ত্রিবিধ স্বতন্ত্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। অনাদিকালই অনন্তদেব বর্ত্তমান, তাঁহার রূপময় ব্রহ্মাণ্ডও অনাদি। কিন্তু পুরাণে সেই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, পূর্ব্বাপর ঘটনারূপে বর্ণিত হইয়াছে, এবং তজ্জন্য ত্রিবিধ দেবতারও কল্পনা হইয়াছে। এই তিন প্রধান দেবতার মধ্যে প্রত্যেকের বিভিন্ন বিভিন্ন নিদর্শানুসারে পরে তেত্রিশ শ্রেণীর দেবমূর্ত্তি হইয়াছে, সেই তেত্রিশ দেবতা ক্রমশঃ তেত্রিশ কোটিতে পরিণত হইয়াছেন।*

* মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ১ম অধ্যায় ৪১ শ্লোক দেখ। অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, ইন্দ্র ও প্রজাপতি, এই তেত্রিশ দেবতা। পৃথিবী, অগ্নি, অন্তরীক্ষ, বায়ু, আদিত্য, দিব্, চন্দ্র ও নক্ষত্র, এই অষ্টবসু। একাদশ রুদ্র একাদশ ইন্দ্রিয়ের (করণের) অধিষ্ঠাতা। দ্বাদশ আদিত্য দ্বাদশ মাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। দেবতা-সৃষ্টির বিস্তার গণনা করিতে হইলে অসংখ্য হয়। কারণ, রুদ্রগণ তিন কোটি ও আদিত্যগণ দশ কোটি। অগ্নির পুত্র পৌত্রও অসংখ্য। দেবতার অর্থ অধিষ্ঠাত্রী শক্তি। আদিত্যের অধিষ্ঠাত্রী শক্তিই আদিত্যদেব। যাহা কর্ত্তৃত্বরূপে প্রতীয়মান, তাহাই দেবতা।

প্রাচীন মিসরের ধর্ম্মসম্বন্ধে লেজ সাহেব এইরূপ লিখিয়াছেন।

"The fundamental idea was that of primitive Ocean, or, if you like to call it chaos of nebulous matter without

হিন্দুধর্ম্মের পূর্ণাবয়ব।

এই পৌরাণিক দেব-সংসারের সৃষ্টিহেতু সামান্য লোকের মনে এমত সংস্কার জন্মিয়াছে, যেন ব্রহ্মাণ্ডপতি অনন্তদেব জগৎ হইতে এক স্বতন্ত্র দেব-পদার্থ। অদ্বৈতবাদ এইরূপে দ্বৈতবাদে পরিণত হইয়াছে। পুরাণ কিন্তু এরূপে সৃষ্ট যে জ্ঞানীরা সেই অদ্বৈতবাদই দেখিতে পান, তাঁহারা দার্শনিক সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাহা দেখিতে পান। সামান্য লোকের সে চক্ষু নাই, সুতরাং

---

form and void, and of a one Infinite and Eternal God who evolved himself and the Universe from his own Essence." * * * * "It is evident that if we admit the two fundamental ideas—1st, that God is the only Real Existence, author of and identical with the Universe,—2nd, that this Incomprehensible essence or First Cause can be made more comprehensible by personifying his various qualities and manifestations, there is no reason why we should stop at there. If we admit a Trinity of Father, Mother and Son, why not admit a daughter and other descendants ; or if you personify the Power to make a Universe, the Knowledge how to make it, and the Will to do it, as Father, Son and Holy Ghost, why not the Benevolence to do it well, and the malevolence to do it badly, and a hundred other attributes which metaphysical ingenuity can devise to account for the complication of the known and the mysteries of the unknown facts of Existence ?"

Human Origins—by S, Laing.

তাঁহারা সেই ইতিহাস-বর্ণিত তত্ত্ব সকল প্রকৃত ঘটনা বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মনে যে সমস্ত বিশ্বাস জন্মিয়াছে, সে সমস্ত বিশ্বাসই ভক্তিমূলক। সে ভক্তি বর্দ্ধিত করাই ভাল, সে ভুর না ভাঙ্গাই ভাল। এই লৌকিক বিশ্বাসমূলক দ্বৈতবাদ এবং তদ্ধেতু পৌরাণিক-সৃষ্টি ও অবতারবাদ * ক্রমশঃ অপরাপর দেশে প্রচারিত হইয়া এক্ষণে পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিদ্যমান দেখা যায়। খৃষ্টীয়, মুসলমান প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম্মে তাহা গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের সহিত অপরাপর ধর্ম্মের প্রভেদ এই, অপরাপর ধর্ম্মে শুদ্ধ দ্বৈতবাদ এবং তদনুসারী সৃষ্টি ও অবতারবাদ দেখিতে পাওয়া যায়; হিন্দুধর্ম্মে দ্বৈতবাদের মূল অদ্বৈতবাদ, এবং সৃষ্টি ও অবতারবাদেরও মূলীভূত হেতু যাহা, সে সমস্তই জাজ্বল্যমান। হিন্দু, বেদ উপনিষৎ ও দর্শন হইতে পুরাণ দেখেন, এবং পুরাণ হইতে বেদে উপনীত হন। হিন্দুধর্ম্মে পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্ম-প্রণালীর পূর্ণ অবয়ব লক্ষিত হয়। হিন্দুধর্ম্ম পূর্ণাবয়বী, অপরাপর ধর্ম্ম অঙ্গহীন। অপরাপর ধর্ম্মে দেহ আছে, মস্তক নাই, কেবল হিন্দুধর্ম্মেই ধর্ম্মের পূর্ণমূর্ত্তি।

---

* এই পৌরাণিক অবতারবাদ দ্বিবিধ—পূর্ণাবতার এবং অংশ বা কলাবতারবাদ। যাঁহারা পূর্ণাবতার স্বীকার না করেন, তাঁহারা অংশাবতার মানেন। যাঁহারা পৌরাণিক অবতারবাদ না মানেন, তাঁহারা দার্শনিক গুণাবতার স্বীকার করেন। পৌরাণিক অবতারবাদ ভক্তজনগণের নিমিত্ত। খ্রীষ্টীয় অবতারবাদ, হিন্দু অবতারবাদ হইতে স্বতন্ত্র। খ্রীষ্টধর্ম্মে Incarnation, God becoming flesh and blood. হিন্দুধর্ম্মে ভগবান্ অবতীর্ণ শক্তিতে অবতীর্ণ। হিন্দুধর্ম্মের অবতারবাদ প্রামাণ্য-মূলক। বিশ্বরূপী ভগবান্ নিজ শক্তিতে উদয় হইয়া বিশ্ব রক্ষা করেন।

এক্ষণে আমরা হিন্দুর ধর্ম্মতত্ত্বে উপনীত হইলাম। হিন্দুর ধর্ম্মভাব কেমন বিস্তৃত ও প্রশস্ত, তাহা এক্ষণে বিলক্ষণ প্রতীত হইতেছে। হিন্দুর ধর্ম্ম অধিকার-ভেদে জনসমাজের সর্ব্বজনসাধ্য। সবাই তাহার সেবক ? সর্ব্বজাতি ও সকল ব্যক্তিরই তাহা অধিগম্য। সমস্ত জনসমাজ লইয়া হিন্দুধর্ম্ম। কি সংসারী, কি বনবাসী তপস্বী, কি জ্ঞানী, কি অজ্ঞানী, সবাই তাহার অধিকারী। সকলেরই জ্ঞান-পরিমাণ-অনুসারে ধর্ম্ম সজ্জিত হইয়াছে। এ ধর্ম্মে সকলেরই পারমার্থিক ক্ষুধা সন্তৃপ্ত হয়। যে রূপে সকলেরই ক্ষুধা সন্তৃপ্ত হইতে পারে, সেইরূপে ধর্ম্ম প্রণালী গঠিত। তাই হিন্দুধর্ম্ম নানা সম্প্রদায়ভুক্ত—শক্তি, বৈষ্ণব, গাণপত্য, পাশুপত এবং সৌর। আবাল-বৃদ্ধ সবাই ধর্ম্মে পরিপুষ্ট হয়। এ ধর্ম্ম শুধু বেদ নয়, উপনিষৎ নয়, দর্শন নয়, স্মৃতি নয়, পুরাণ নয়, তন্ত্র নয়, বৈষ্ণব-শাস্ত্র নয়, কিন্তু সে সমস্তই। শুধু নির্গুণ বিদ্যা নয়, সগুণ-বিদ্যা নয়, প্রতিমা-পূজা নয়, কিন্তু সে সমস্তই। যোগী, ঋষি, মুনি, আচার্য্য, দণ্ডী, ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী, বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, বৈরাগী, সংসারী, নারী, ভৈরবী, জাপক, তপস্বী, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—সবাই হিন্দু। ভক্তিপথ হইতে জ্ঞানপথে সবাই একে একে এবং ধাপে ধাপে সজ্জিত—বিভিন্ন অধিকার অনুসারে সজ্জিত। সমগ্র প্রবৃত্তি-পথ এ ধর্ম্মের মহাশরীর, কাম্যকর্ম্মাদি এ ধর্ম্মের বিশাল দেহ, নিষ্কামতত্ত্ব সেই দেহের স্কন্ধ, নির্গুণ-বিদ্যা তাহার শির এবং মোক্ষ তাহার ব্রহ্মরন্ধ্র। এ ধর্ম্ম ফল-পুষ্প-সমন্বিত, শাখা-প্রশাখায় সুবিস্তৃত, পত্রাদি-পরিপূর্ণ, মহাকায়-সমৃদ্ধ মহীরুহ। যোগী, তপস্বী, সংসারী, পশু, পক্ষী, পতঙ্গ, কীট, সমস্ত সংসার,

সেই জগৎ ব্যাপ্ত প্রেমময় অহিংসক বৃক্ষের আশ্রিত। হিন্দুধর্ম্মের উদ্যানে সর্ব্ব বৃক্ষ সুসমৃদ্ধরূপে সঞ্জাত হয়। এ ধর্ম্ম শুদ্ধ শুষ্ক নীরস জ্ঞান নহে, শুদ্ধ হৃদয়ের ব্যাপার নহে, কিন্তু তদুভয়ই।

এ ধর্ম্ম, সকলকেই শান্তিপথে লইয়া যাইতে চাহে। হিন্দু-ধর্ম্মাশ্রিত জনগণ, অতি ধীর-প্রকৃতি ও শান্ত-স্বভাব। অপরাপর ধর্ম্মাবলম্বী সামান্য জনগণের সহিত সাধারণ হিন্দু-সমাজের তুলনা করিয়া দেখ, এমন সদ্ভাবসম্পন্ন, সহৃদয়, শান্তপ্রকৃতি, ধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান্, সচ্চরিত্র লোকসমাজ কুত্রাপি বিদ্যমান নাই। অধিকার অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মপদ্ধতি প্রচলিত আছে বলিয়া হিন্দুসমাজে এই ফল ফলিয়াছে। হিন্দু ভিন্ন কোন ধর্ম্মে সমস্ত হৃদয়ের প্রবৃত্তি-অনুসারিণী পূজাপদ্ধতি প্রচলিত নাই। অপরাপর ধর্ম্মে অনন্ত জ্ঞানময়ের ও সর্ব্বশক্তিমানের মানসিক-পূজা থাকিতে পারে; কিন্তু সমস্ত হৃদয়ানুরাগ দ্বারা এরূপ বিস্তৃতভাবে সর্ব্বসুন্দরের প্রতিমা-পূজা কোন ধর্ম্মে নাই। যে সাকারপূজা লইয়া হিন্দুধর্ম্ম, সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা অন্য ধর্ম্মের সম্পূর্ণতা সাধন করে নাই। যে সাকার-পূজা, সমস্ত হৃদয়ের উৎসর্গ-ব্যাপার—যে হৃদয়োৎসর্গ-ব্যাপার, বাহ্য-বিকাশ না পাইলে সন্তুষ্ট হয় না, যাহা সমস্ত জগৎ উৎসর্গ করিয়া যেন তৃপ্ত নহে,—যেন আরও কিছু পাইলে দেবচরণে সমর্পণ করিত—যে হৃদয়-ব্যাপার যেন কি করিবে, কি দিবে খুঁজিয়া পায় না—যাহা সহস্র-রূপ বাহ্য-বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াও সন্তুষ্ট নহে, যেন আরও কত কি করিতে আকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে পারে না—হৃদয়ের সেই সহস্র-রূপ বাহ্য-বিকাশ-সম্বলিত পূজা-পদ্ধতি, হিন্দু ব্যতীত অন্য ধর্ম্মের ত্রিসীমায়ও যায় না। লোকে জ্ঞানে আকৃষ্ট হয় বটে, শক্তিকে

আশ্চর্য্য হইয়া অবলোকন করে বটে, কিন্তু সুন্দরকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়ে। হিন্দু মোহিত হইয়া সুন্দরকে দেখিয়াছে। কিন্তু হিন্দু মোহিত হইয়া সে সর্ব্বসুন্দরকে পূজা করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই। সেই মোহে অনন্ত জ্ঞানবান্‌কে সুন্দর করিয়া দেখিয়াছে, এবং সর্ব্বশক্তিমান্‌কেও সুন্দর করিয়া দেখিয়াছে। দেখিয়া আবার সমস্ত হৃদয়ের সহিত সেই জ্ঞান এবং শক্তিরই পূজা করিয়াছে। হিন্দু শৈব, সৌর, শাক্ত, গাণপত্য এবং বৈষ্ণব। কিন্তু কি শাক্ত, কি শৈব, কি বৈষ্ণব—সকলেরই পূজা হৃদয়ের পূজা। যে হৃদয়ে বৈষ্ণব, শ্যামসুন্দরের পূজা করে, সেই হৃদয়ে শৈব, দেবদেব মহাদেব মহেশ্বরের পূজা করে এবং সেই হৃদয়েই শাক্ত, আদ্যাশক্তি ভগবতীর পূজা করে। হিন্দু কবি হইয়া কাব্যরসে দেবপূজা নিষিক্ত করে। হিন্দুর পূজা কবির পূজা—সে পূজা, ভক্তি মহাকাব্যের বিরাট বিকাশ—তাহা জ্ঞানের নীরস ব্যাপার নহে। যে মানসিক সাকার ঈশ্বরোপাসনা শুদ্ধ উচ্চাধিকারী হিন্দুজ্ঞানিগণের জন্য ব্যবস্থিত—যাহা হৃদয়বান্ সামান্য জনগণ গ্রহণ করিতে অসমর্থ, অপরাপর ধর্ম্মে শুদ্ধ সেই মানসিক উপাসনা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাহাতে কি জনসমাজের সাধারণ অগণ্য লোকের তৃপ্তিসাধন হয়? সেইরূপ নীরস জ্ঞানমূলক ধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্ম। তাহাতে জ্ঞান আছে, ধ্যান আছে, কিন্তু হৃদয়ার্দ্রকারী রসসংযুক্ত পূজাপদ্ধতি নাই। ইসলাম-ধর্ম্ম ততোধিক নীরস। ইউরোপীয় খৃষ্ট-সমাজের ধর্ম্ম আরও নীরস। তাহা শুদ্ধ যাজক ও পাদরীগণের সাধ্য হইয়াছে। সাধারণ জনসমাজের অধিকাংশই ধর্ম্ম হইতে অনেক দূরে পড়িয়া আছে। তাহারা এক নির্দ্দিষ্ট দিনে দেশীয় রীত্যনুসারে চর্চ্চে গিয়া কতকগুলি জ্ঞান-

গর্ভ নীরস ও শুষ্ক কথা শুনিয়া, কতকগুলি অভ্যাস-আচরিত অনুষ্ঠান, ও শুষ্কবাক্য উচ্চারণ করিয়া ধর্ম্মপালন করিয়া আইসে—ধর্ম্মের দায় হইতে মুক্ত হয়। সে ধর্ম্মব্যাপার সমস্ত অভ্যস্তব্যাপার। পাদরীর জ্ঞানগর্ভ কথা সকল অনেকের হৃদয়ে পৌঁছে না, অনেকের অভ্যস্ত অনুষ্ঠান ও বাক্যাদি হৃদয় হইতে সমুত্থিত হয় না। আবার যাঁহারা বাইবেল-নিবদ্ধ জ্ঞানেরও উচ্চে উঠিয়াছেন, খৃষ্টসমাজে সেই জ্ঞানিগণ কি করেন? তাঁহারা হয় ত চর্চ্চের ত্রিসীমায়ও যান না। কারণ, পাদরীগণের নিকৃষ্ট জ্ঞানমূলক কথায় ও উপাসনাপদ্ধতিতে তাঁহারা যোগ দিতে পারেন না। তাঁহারা দেখেন, বাইবেল না সূক্ষ্মজ্ঞান-সম্মত, না কাব্যরসাশ্রিত। উচ্চ জ্ঞানিগণের তীক্ষ্ণবুদ্ধি তাহাতে শত ছিদ্র দেখিতে পায়। যে খৃষ্টীয় জ্ঞানিগণ বাইবেলের ঈশ্বরতত্ত্ব মানিতে চান না, অথচ যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের অদ্বৈতবাদে আসিয়া উপনীত হন নাই, তাঁহারা সুতরাং নিরীশ্বরবাদী হইয়া থাকেন। ধর্ম্মে তাঁহাদের আস্থা নাই। এদিকে সামান্য জনগণের রসাশ্রিত হৃদয় পাদরীর নীরস উপদেশ গ্রহণ করিতে চাহে না, সুতরাং বাইবেল, শুদ্ধ সমাজের এক সামান্য অংশের জন্য রহিয়াছে। সেই শ্রেণীস্থ জনগণের নিম্নে ও উর্দ্ধে যে নানা শ্রেণীর লোক বিদ্যমান রহিয়াছে, বাইবেল তাহাদের কিছু করিতে পারে না। তাহাদের ধর্ম্মভাব স্বভাবতঃ যেরূপে প্রবৃদ্ধ অথবা নীচগামী হইতে চায়, সেইরূপই বাড়িতে থাকে, অথবা নীচগামী হইয় পড়ে। সকল লোকের অধিকার-অনুসারে ধর্ম্মকে না গড়িলে জনসমাজের গতি এইরূপ হইবেই হইবে। এজন্য বেদ হইতেই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এবং সকাম ও নিষ্কাম পথের ধর্ম্ম-পদ্ধতি

প্রচলিত। সেই অধিকার-তত্ত্ব হিন্দু-জনসমাজ হইতে ছাড়িয়া দাও, হিন্দুশাস্ত্র সমুদয় অত্যন্ত দুর্ব্বোধ হইয়া পড়ে। আর অধিকার-তত্ত্ব ধর, হিন্দুশাস্ত্রের নানাবিধ মতামত অতি পরিষ্কার হইয়া যায়। সমস্ত জনসমাজের উপযোগী করিয়া হিন্দুধর্ম্মের সৃষ্টি। হিন্দুধর্ম্ম ভিন্ন, এ উপযোগিতা আর কোন ধর্ম্মে নাই। এজন্য বলিয়াছি, অপরাপর ধর্ম্ম অঙ্গহীন, কেবল হিন্দুধর্ম্মই পূর্ণাবয়ব।

হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃতি।

যদি সংসারের পাপস্রোত নিবারণ করা, যদি ইন্দ্রিয় ও রিপুর সংযম করা ধর্ম্মের উদ্দেশ্য হয়, তবে অবশ্য বলিতে হইবে, শুদ্ধ হিন্দুধর্ম্মেই সে উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইয়াছে। অতীত-সাক্ষী ইতিহাস ও পুরাবৃত্তই এ কথার প্রমাণ। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ খৃষ্টীয় জনসমাজের ইতিহাস গ্রহণ কর। সে ইতিহাস তোমার সমক্ষে খৃষ্টীয় জাতিসমূহের কিরূপ বিবরণ দিতেছে? ঐ দেখ, ইউরোপীয় জাতিগণ লোভের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পৃথিবীময় ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। তরবার, কামান, বহ্নি ও লুণ্ঠন-ব্যাপারে পৃথিবী ছারখার করিতে উদ্যত হইয়াছে। নিজ খৃষ্টীয় জনসমাজে ইউরোপীয় জাতিসমূহ পরস্পর রক্তারক্তি ও লুণ্ঠন ব্যাপারে প্রবৃত্ত। কেহ কাহারও মিত্র নহে। এক খৃষ্টীয় জাতি অপর খৃষ্টীয় জাতির পরম শত্রু। খৃষ্টীয় জাতিগণ পরস্পরকে ঘৃণাচক্ষে দেখে। এ কি খৃষ্টীয় প্রেম? খৃষ্টীয় ইতর জনসমাজ মধ্যে পাপস্রোত দুর্নিবার বেগে প্রবাহিত হইতেছে। সেই সমাজের পাপ-পরিমাণ, হিন্দু-জনসমাজের পাপ-পরিমাণের সহিত তুলনাই হয় না। ইউরোপীয়

খৃষ্ট-জাতির ইতিহাস পড়িবার যো নাই। তাহার প্রতিপত্র রক্তরাগে কলঙ্কিত। পড়িতে শরীর লোমাঞ্চিত হয়। ইউরোপীয় ধর্ম্মেতিহাস আরও ভয়ঙ্কর। প্রাচীন ক্যাথলিক্-ধর্ম্মের ইতিহাস ঘোর পাপাচার ও নির্দ্দয় অনুষ্ঠানে পরিপূর্ণ। হত্যাকাণ্ড তাহাকে রুধিরাক্ত করিয়া রাখিয়াছে। ক্যাথলিক্ ও প্রটেষ্ট্যাণ্ট্ সম্প্রদায়ের বিগ্রহ-ব্যাপার আরও ভয়ঙ্কর। সে কি ধর্ম্মের ইতিহাস? মহা-ভারত! খৃষ্ট যদি আজি জীবিত হন, তিনি ইউরোপ-প্রচলিত ধর্ম্মের ইতিহাস দেখিয়া নিশ্চয় বলিবেন, আমি তো এ ধর্ম্মের কখন উপদেশ দিই নাই। পাদরীগণের উচিত, খৃষ্টোক্ত প্রকৃত খৃষ্টধর্ম্ম, ইউরোপীয় জনসমাজে প্রচার করা। তাঁহারা অগ্রে স্বদেশকে প্রকৃত পক্ষে খৃষ্টান করুন, তার পর অন্য দেশে যাই-বেন। যদি ফল দেখিয়া ধর্ম্মের বিচার করা যায়, তবে অবশ্য বলিতে হইবে, খৃষ্টধর্ম্ম নিশ্চয় বিফল হইয়াছে। তাহাতে জন-সমাজের পাপস্রোত বরং বর্দ্ধিত হইয়াছে। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের সামা-জিক ফলাফল দেখ; দেখিয়া বল দেখি, কোন্ ধর্ম্মপ্রণালী শ্রেষ্ঠ? যদি জনসমাজের পাপস্রোত নিবারণ করা, যদি জনসমাজকে প্রকৃত মনুষ্যত্বে আনা, যদি পাশবভাব দমন করিয়া দেবভাবের স্ফূর্ত্তিসাধন করা ধর্ম্মের লক্ষ্য হয়, তবে বলিতে হইবে, হিন্দুধর্ম্মে সে লক্ষ্য সুসম্পাদিত হইয়াছে। যদি জনসমাজকে মনুষ্যত্ব প্রদান করা ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ হয়, তবে অবশ্য বলিতে হইবে, হিন্দু-ধর্ম্ম সেই লক্ষণ সম্পন্ন। আজি পর্য্যন্ত ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ধর্ম্মের যে সকল লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সে সকল লক্ষণ, হিন্দুধর্ম্মের উপযুক্ত নহে। হিন্দুধর্ম্মানুসারে ধর্ম্মের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিলে এই দাঁড়ায়—

To humanize the whole society is religion. *

যাহাকে মনুষ্যত্ব † বলে, সেই মনুষ্যত্বে সমগ্র লোকসমাজকে ভূষিত করাই ধর্ম্মের কার্য্য। কঠিনকে কোমল করা, দুরন্তকে শান্ত করা, অশিষ্টকে শিষ্ট করা, দুর্ব্বৃত্তকে সুশীল করা, কোপন-স্বভাবকে ক্ষমাশীল করা, নির্দ্দয়কে দয়াপূর্ণ করা, আর সমুদায় সংসারকে প্রেমে আবদ্ধ করিয়া মুক্তিপথে আনা, যদি ধর্ম্মের কার্য্য হয়, তবে সে কার্য্য, হিন্দুধর্ম্ম দ্বারা এত কাল সুসম্পন্ন হইয়া আসিয়াছে। এইরূপে হিন্দুধর্ম্ম, লোককে মোক্ষপথে আনিয়া থাকে। হিন্দুর মোক্ষপথ অতি সুদীর্ঘ ও প্রশস্ত। প্রবৃত্তিপথে সেই মোক্ষ আরব্ধ হইয়া ক্রমে নিবৃত্তিপথে আইসে। অজ্ঞানীর জন্য ভক্তিপথ এবং জ্ঞানীর জন্য জ্ঞানপথ। ক্রমে মানব, পাপ-পথ হইতে পুণ্যপথে আইসে। এই মোক্ষ-পথে বিভিন্ন জনগণের জন্য নানা উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে সেই উপায় ধরিয়া লোকে মোক্ষে উপনীত হয়। খৃষ্টীয় ধর্ম্মের মত একমাত্র উপায়ে হিন্দুধর্ম্ম, মোক্ষপথ নির্দ্দেশ করে নাই। খৃষ্টীয় ধর্ম্মে একজনের পাপ আর একজনের ঘাড়ে দিয়া লোকে মুক্তিলাভ করে। খৃষ্টীয় ধর্ম্মের মোক্ষপথ একটি গ্রাণ্ড্ ট্রান্সফার এণ্ট্রি। সেরূপ অলৌকিক উপায়ে হিন্দুর মুক্তিসাধন হয় না। হিন্দুর মুক্তি, সংযমপথে। ক্রমে সংযমী হইয়া হিন্দু, মোক্ষপথে অগ্রসর হন। নানাবিধ উপায়ে, যে যেমন অধিকারী, তাহার তদ্রূপ

---

* যাহা লোকমণ্ডলী বা সমাজের সর্ব্বাঙ্গ ধারণ করিয়া রহিয়াছে তাহাই ধর্ম্ম।

† সাহিত্য-চিন্তায় এই মনুষ্যত্বের প্রকৃতি ও ধর্ম্ম বিশেষরূপে পর্য্যালোচিত হইয়াছে।

উপায়ে মোক্ষলাভ হয়। এজন্য হিন্দুধর্ম্মের মোক্ষপথ নানাবিধ। এক অধিকার-তত্ত্ব বুঝিতে পারিলেই সেই পন্থা সমস্ত বুঝা যায়। পন্থা বিবিধ বটে, কিন্তু মোক্ষ এক। জীবের ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তিই মোক্ষ। নির্ব্বাণ বল, লয় বল, সাযুজ্য বল, সকলই একস্থানে আসিয়া উপনীত। মোক্ষ এক বলিয়া, লক্ষ্যও এক। সংসারের প্রবৃত্তিপথের যে লক্ষ্য, নিবৃত্তিপথেরও সেই লক্ষ্য। এক লক্ষ্য ও মোক্ষ ধরিয়াই হিন্দুধর্ম্ম সৃষ্ট। অধিকার-তত্ত্বই সেই লক্ষ্য অনুসারে জনসমাজকে গড়িয়া আনিতেছে। * সংসারে ভোজনে, পানে, বিবাহে, ক্রিয়াকলাপে, বিষয়ব্যবসায়ে, হিন্দুর কোন্ কার্য্যে সে লক্ষ্য প্রতীয়মান না হয়? আবার তত্ত্বপথে, আরণ্যআশ্রমে, সেথায়ও সেই লক্ষ্য। হিন্দুধর্ম্ম হৃদয়ের ব্যাপার, জ্ঞানের ব্যাপার, শরীরের ব্যাপার। মনুষ্যের সমস্তটাই হিন্দুধর্ম্ম। ব্রহ্মচর্য্য, সংসার-আশ্রম, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস, এ সমস্ত লইয়া হিন্দুধর্ম্ম। সুতরাং হিন্দুকে সুগঠিত করিয়া ধর্ম্ম মোক্ষপথে লইয়া যায়। সংসারের প্রবৃত্তিপথ এরূপে সজ্জিত যে, সে সংসারের হৃদয়ের ভাবে, সামাজিক ব্যবস্থায় ও প্রেমপ্রভাবে তোমাকে নিশ্চয় নীয়মান ও সুগঠিত হইতে হইবে। সংসারের অলক্ষিত প্রভাবে তোমাকে

---

* শ্রুতি বলিয়াছেন, ব্রত বা কর্ম্ম করিতে করিতে দীক্ষা—যোগ্যতা হয়, দীক্ষা বা যোগ্যতা হইলে দক্ষিণা—কৃতকর্ম্মের ফললাভ হয়, কৃতকর্ম্মের ফল প্রাপ্তি হইলে, শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে এবং শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস জন্মাইলে, সত্য, জ্ঞান এবং অনন্ত স্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করা যায়।

"আর্য্যশাস্ত্র-প্রদীপ" হইতে উদ্ধৃত।—শুক্লযযুর্ব্বেদ সংহিতা—১৯। ৩০দেখ। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, কর্ম্ম ও ব্রহ্মবিদ্যা মোক্ষেতর ফলার্থী বিদ্যা; এই বিদ্যা হইতে ক্রমে মুক্তিফলার্থী বিদ্যায় উঠিতে হয়।

কার্য্য করিয়া যাইতে হইবে। হিন্দুসংসার এইরূপে সজ্জিত আছে। হিন্দু-জনসমাজকে নিয়মিত করা, প্রবৃত্তিমার্গের মহা উদ্দেশ্য। সংসার-আশ্রমে হিন্দুর জনসমাজে সে উদ্দেশ্য অতি প্রকৃষ্টরূপে সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। আজি শত-সহস্র বৎসরের হিন্দুজাতির ইতিহাস এ কথা প্রতিপন্ন করিতেছে। সেই সংসারাশ্রমস্থ হিন্দু জনসমাজকে গড়িয়া আনিবার জন্য হিন্দুশাস্ত্রের সগুণ বিদ্যার বিস্তারিত সৃষ্টি। জনসমাজকে সৎপথে রক্ষা করিবার জন্য, সংসারকে ধারণ করিবার জন্যই ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্মের সূত্র ধরিয়া হিন্দু ঋষি সগুণ উপাসনা-পদ্ধতির এত গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্রে নির্গুণবাদের শাস্ত্রাদি তত বিস্তৃত নহে। যেহেতু নির্গুণবাদী আপনার পথ আপনি বুঝিয়া লইতে পারেন। কিন্তু যেখানে জনসাধারণের মূর্খতাই প্রবল, সবাই মায়া-মোহে অন্ধ, সেখানে সেই মূর্খ জনগণকে নিয়মিত করাই প্রধান কার্য্য। তজ্জন্যই স্মৃতি ও পুরাণাদির বিশাল সৃষ্টি। সেই পুরাণ-সৃষ্টির মোহে যেন জনগণ অন্ধ হইয়া কার্য্য করিতে পারে, এরূপ করিয়া সে শাস্ত্র রচিত হইয়াছে। সে অভিপ্রায় বিলক্ষণ সুসিদ্ধ হইয়াছে। হিন্দু-সমাজ, পুরাণের মোহ-নিগড়ে আবদ্ধ। জনসমাজ, প্রবৃত্তি-পথে সংসার স্রোতে ধর্ম্মানন্দে ভাসিয়া যাইতেছে।

পুরাণ-তত্ত্ব।

এই পুরাণ সমস্ত, হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের অতুল সম্পত্তি। আর কোন ধর্ম্মে এরূপ সাহিত্য রচিত হয় নাই। ভারতীয় দৃষ্টান্তে প্রাচীন একেডিয়া, এসেরিয়া, মিসর গ্রীশ প্রভৃতি দেশে যে পৌরাণিক সাহিত্য প্রচারিত ছিল, তাহার লোপ হইয়াছে। এক এক খানি

পুরাণ, এক একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য। সে কাব্যের শীর্ষ-স্থানে রামায়ণ ও মহাভারত। ঘটনা-কল্পনার প্রাচুর্য্যে, দেবমূর্ত্তিকল্পনায় অদ্ভুত কবিত্ব-বিকাশে এবং ভক্তিরসের তরঙ্গে সমস্ত পুরাণই আপ্লুত। কল্পনার সমৃদ্ধ সৃষ্টিপ্রভাবে, কবিত্বের সৌন্দর্য্যে এবং ভক্তির মহিমায় অমানুষী বর্ণনা কোথায় যে ডুবিয়া যায়, তাহার ঠিক্ থাকে না। এক এক পুরাণ পড়িলে, মন ভক্তিরসে পরিপূর্ণ হয়; তাহার কল্পনারাজ্য, মানসপটে অঙ্কিত হইয়া যায়। তাহার চিত্র সকল, হৃদয়ে সজীবতা লাভ করিয়া সশরীরে বিচরণ করিতে থাকে। কল্পনায় আমরা তাহাদিগকে যেন সত্য জীবিত চরিত্র-রূপে দেখিতে পাই। সেই চরিত্রাশ্রিত রসপ্রাচুর্য্যে হৃদয় আর্দ্র হয়। চিত্ত, দেবপূজার জন্য উন্মুখ হয়। হৃদয়, কাব্য গড়িয়াছে; কাব্য আবার হৃদয়কে গড়িয়া আনে। মন মুগ্ধ হইয়া পড়ে। প্রশংসা করিব—পুরাণের কল্পনা-সৃষ্টিকে, না—তাহার রসপ্রভাবকে? ঋষিগণের পৌরাণিক সৃষ্টি ও কবিত্ব, এতই সুন্দর ও মনোহর! জগতে এরূপ কাব্যাবলি অতুলনীয়। ঋষিগণ, সেই পুরাণের সৃষ্টি করিয়া হিন্দুসমাজকে এক অতুল ভক্তিরসে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। সগুণ ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য ও বিভূতি সকল, মূর্ত্তিমান্ করিয়া দেখাইয়াছেন। মানসিক-দেবভাব, সশরীরে আমাদের সম্মুখে অবস্থান করিতেছে। নিরাকার ঈশ্বর, ভক্তের মানসে যে সমস্ত শক্তিরূপে বর্ত্তমান, সেই শক্তি-সমূহ, বাহ্যাবয়বে হৃদয়ের অর্চ্চনার সামগ্রী হইয়াছে। তিনি সূক্ষ্ম ভাবে হৃদয়েই বিরাজ করুন, বা সেই ভাব বাহ্যাবয়বেই প্রকটিত হউক, সে একই কথা—তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। সামগ্রী যা', তাই আছে। ঈশ্বর যাহা, তাহা হৃদয়েই অনন্ত-

রূপে বিরাজ করিতেছেন। সেই হৃদয়ের প্রতিবিম্ব-রূপই প্রতিমা। আন্তরিক পূজার প্রতিবিম্ব-পূজাই প্রতিমা-পূজা।

প্রতিমাপ্রতিষ্ঠা ও পূজার সামাজিক ফল।

ব্যাস, * পুরাণের স্থষ্টিতে হিন্দু-সমাজে প্রতিমা-পূজার সম্যক্‌-রূপে প্রতিষ্ঠা করিয়া হিন্দুধর্ম্মকে জনসমাজের হৃদয়ধামে দৃঢ়-প্রোথিত করিয়া গিয়াছেন। বৈদিক, ঔপনিষদিক ও দার্শনিক জ্ঞান, কবিত্বে কুসুমিত হইয়া সামান্য জনগণের চিত্তরঞ্জন করিয়াছে। পূজাদি, উৎসব-ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। পূজার সময় জনসমাজ, উল্লাসে পরিপূর্ণ হইয়া উৎসবে মত্ত হইয়া পড়ে। তত আনন্দ হৃদয়ে বুঝি আর ধরে না! লোকের এই ভাব, প্রতিমাপূজায় বাহির হইয়াছে। এই সর্ব্বসাধারণের ভক্তিমূলীয় উৎসব-ব্যাপার, হিন্দুজনসমাজ পরিত্যাগ করিতে পারে কি? এ তো শুষ্ক মানস-ব্যাপার নহে; এ হৃদয়ের তরঙ্গোচ্ছ্বাস—ব্যাসের কবিত্বময় উদ্যান—ভক্তির কুসুমিত কাননে হৃদ্বৃত্তিরূপা কামিনীগণের ভগবৎবিলাস ও বিহার—গোপকন্যাগণের কৃষ্ণলীলা—হৃদয়-ভাবে সমস্ত জনসমাজকে পূর্ণ করা। পৌরাণিক অসংখ্য দেবদেবীর মূর্ত্তিতে জনগণের হৃদয়, অসংখ্য স্রোতে বিসারিত হয়। শুদ্ধ মন্ত্রে হিন্দু, পূজা করিয়া সন্তুষ্ট নহেন। সেই মন্ত্রকে তিনি অবয়বী করিয়া মূর্ত্তিমান্‌ করেন। মন্ত্র-ব্রহ্ম বাহ্যরূপে দেদীপ্যমান হন। তাঁহাকে মূর্ত্তিমান্‌ করেন কি জন্য? ষোড়শোপচারে পূজা করিবার জন্য। শুদ্ধ ভক্তি করিয়া হিন্দু তুষ্ট নহেন—প্রীতি,

* এই সমস্ত পুরাণ এক ব্যাসলিখিত, কি নানা ঋষি-রচিত ব্যাসনিবদ্ধ বাক্য, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না।

বাৎসল্য, স্নেহ প্রভৃতি যত প্রকার কোমল ভাব, হৃদয়ে বর্ত্তমান আছে, হৃদয়ের সেই সমস্ত কোমল ভাবে দেবতাকে কুসুম-মালায় শোভিত ও তাঁহার পাদপদ্মে প্রস্ফুটিত কমলদল অর্পণ করিয়া হিন্দু, পূজা করিতে চাহেন। মানবের এই সর্ব্বব্যাপী হৃদয়ের প্রসারণ বুঝিয়া আর্য্যধর্ম্মে দেবদেবী ও প্রতিমার পূজা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এরূপ না করিলে সে সর্ব্বব্যাপী, বিশাল হৃদয় সন্তৃপ্ত হইত না। ধর্ম্ম সাধারণ জনগণকে স্বর্গের রসাস্বাদনে সম্ভোগী করিয়াছে। অজ্ঞানীর কুটীরে বা ঐশ্বর্য্যালয়ে পারমার্থিক মহারত্ন বিতরণ করিয়াছে। ব্যাস নিজে ব্রহ্মজ্ঞানে যে আনন্দে উন্মত্ত, সেই আতন্দের কিয়ৎপরিমাণ সকলকে দিতে ব্যস্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার কল্পনার ও কাব্যসৃষ্টি-শক্তির অভাব ছিল না। তাই সমদর্শী ব্যাসদেব, আর্য্যসমাজকে চিরদিনের জন্য এক অপূর্ব্ব আনন্দে ও পারমার্থিক উৎসবে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়া গিয়াছেন।

প্রতিমা-পূজা আছে বলিয়া, হিন্দুদের দেবভক্তি এত প্রবল। সামান্য জনগণের দেবভক্তির এই জন্য এত উন্মেষ হইয়াছে। অতি শৈশবাবস্থা হইতে হিন্দুরা দেবদেবীর প্রতি ভক্তি করিতে শেখে। পূজার আনন্দে বালকবালিকারাও মাতিয়া যায়; প্রতিমার সম্মুখে যোড়-হস্তে প্রণিপাত করে; দেবতা দেখিলেই প্রণাম করে। সেই ভক্তি ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধি-সহকারে স্ফুরিত হইতে থাকে। স্ত্রীলোক ও মূর্খজনের ভক্তি, শিশুদিগের ভক্তির মত ক্রমশঃ স্ফূর্ত্তিলাভ করে। ব্রহ্মচর্য্যধারিণী আর্য্যবিধবাগণ, দেবপূজা ও দেবারাধনা লইয়াই কালাতিপাত করিয়া থাকেন। তাহাই তাঁহাদের জীবনের কার্য্য ও মহাব্রত। সাক্ষাৎ দেবতা না

দেখিলে সামান্য জনগণের দেবভক্তির বিকাশ, হিন্দুদের মত সম্ভবে না। হিন্দুদের দেবদেবী যে স্থানে প্রতিষ্ঠিত, সে স্থানের মাহাত্ম্য অধিক। অধিক কি জন্য? দেবাধিষ্ঠানের জন্য। দেবাধিষ্ঠানের জন্য তাহা তীর্থস্থান। লোকে কত ভক্তিসহকারে, কত ক্লেশ সহ্য করিয়া এক এক তীর্থস্থানে আসিয়া দেবদর্শন করে। ভক্তির টানে সবই সহ্য হয়। দেবতার প্রতিমা-প্রতিষ্ঠা না থাকিলে, কি এত দূর ভক্তির টান হয়? স্ত্রীলোকের এ টান দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। কোলের শিশুসন্তান ফেলিয়াও কুলবধূগণ তীর্থধামে ছুটিতেছেন। তীর্থদর্শন আর্য্যকুলবিধবাগণের একটি প্রধান কার্য্য। নারীগণ, পথের অসহ্য ক্লেশ অনায়াসে বহন করেন; দেবদর্শনে পরমপুলকে পূর্ণ হন। এ আনন্দ বুঝি আর কিছুতে হয় না। আর্য্যসমাজ, এই ধর্ম্মামোদে ও ভক্তিরসে পরিপূর্ণ রহিয়াছে।

হিন্দুর প্রতিমা যেখানে প্রতিষ্ঠিত, হিন্দু সেই মন্দির-সমক্ষে আসিলেই একবার ভক্তিসহকারে ব্রহ্মাণ্ডপতি বা সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী প্রতুলকর্ত্রীকে স্মরণ করেন; স্মরণ করিয়া করপুটে প্রণাম করেন। দৈবানুরাগী সকাম ভক্ত, নিজ ইষ্ট-সাধনার্থ দেব-কৃপা প্রার্থনা করেন। নিষ্কাম ভক্ত, কুন্তীদেবী বা প্রহ্লাদের মত কেবল ভক্তিই প্রার্থনা করেন। এ সুবিধা মুসলমানের মসিদে ও খৃষ্টানের চর্চ্চে নাই। মুসলমান, মসিদ পার হইয়া যাইতেছে, কেহ এক বার দাঁড়াইয়া পরমেশ্বরকে স্মরণ করে না। কত খৃষ্টান চর্চ্চ অতিক্রম করিয়া যাইতেছে, কেহ চর্চ্চের সম্মুখে একবারও ঈশ্বরকে স্মরণ করিবার জন্য ক্ষণিক স্থির হয় না। কিন্তু হিন্দুর অমনই দেবমন্দির পার হইবার যো নাই। সে

স্থানে যত বার দেবমন্দিরে বিগ্রহকে দেখিবে, হিন্দু তত বার নতশির হইয়া ঈশ্বরকে স্মরণ করিবে। যে না করে, সে হিন্দু নহে। হিন্দু সেই বিগ্রহকে প্রণাম করে না; সেই মূর্ত্তি, যে নিরাকার সর্ব্বব্যাপ্ত পরমেশ্বরের নিদর্শন, সেই পরমেশ্বরকে একবার ভক্তিপূর্ব্বক মনের উৎসাহে ও আনন্দে ডাকিয়া লয়। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী পরমেশ্বরী ব্রহ্মময়ী ভগবতী বা দেবদেব মহেশ্বর বলিয়া সম্বোধন করেন। তখন তাহার মনে সে বিগ্রহমূর্ত্তি কোথায়? সেই বিগ্রহমূর্ত্তি তাহার নিকট নিদর্শনমাত্র। বৈষ্ণব, কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখিয়া অনন্তদেব নারায়ণকে স্মরণ করেন। এ কি প্রতিমা-পূজা? না অনন্তদেবের উপাসনা। প্রতিমা দেখিলে হিন্দুর মনে কি ভাবের আবির্ভাব হয়? সেই ভাবে হিন্দু একবার ব্রহ্মাণ্ডপতিকে ডাকিয়া তৃপ্তিলাভ করেন। হিন্দুর মনে যে ভাবের আবির্ভাব হয়, তাহা কি পৌত্তলিকতা? হিন্দুর মনে মূর্ত্তিপূজা কৈ? সেই মূর্ত্তি যাঁহার নিদর্শন, হিন্দুর মনে তিনিই সর্ব্বক্ষণ বিরাজ করিতেছেন। প্রতিমা তাঁহাকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। তজ্জন্য হিন্দুর মনে সততই অনন্তদেব বিদ্যমান রহিয়াছেন।

এক্ষণে বোধ হয়, বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে, আর্য্যদিগের প্রতিমা-পূজার অনুষ্ঠান, শুধু আন্তরিক পূজা নহে; উহাতে সামাজিক পূজাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নিরাকারের আন্তরিক সূক্ষ্ম সাকার পূজা যাহা, তাহার সহিত বাহ্য প্রতিমাপূজার প্রভেদ কিছুই নাই বলিলে হয়। যেহেতু, ঈশ্বর অন্তরেই থাকুন, বা ভক্তের সমক্ষে নিদর্শানুযায়ী বাহ্যাবয়বেই প্রকটিত হউন, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। যে ঈশ্বরকে ভক্ত, হৃদয়ে পূজা

করেন, বাহিরে প্রতিমার নিদর্শনেও সেই ঈশ্বরকে পূজা করেন। অন্তরে নিরাকার সূক্ষ্ম শক্তিরূপিণী, বাহিরে স্থূল সাকার-শক্তি-রূপিণী। ঈশ্বরে অনুরাগ স্থাপন এবং চিত্তের একাগ্রতা সাধন করিবার জন্য এই স্থূল ও সূক্ষ্ম সাকার উপাসনার সৃষ্টি। স্থূলে যত শীঘ্র একাগ্রতা জন্মে, সূক্ষ্মে তত শীঘ্র নহে। তাই, সাকার ঈশ্বরোপাসনা যোগের এক অঙ্গ মাত্র। তাহা নিরাকার ব্রহ্মোপাসনায় যাইবার ধ্রুব পন্থা।

নিষ্কাম উপাসক, যেমন সমস্ত কর্ম্মই ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া থাকেন, ঈশ্বর-প্রাণগত-সকাম উপাসকও, তেমনই সমস্ত কার্য্যেই ঈশ্বরে নির্ভর করিয়া থাকেন। দৈববলে তাঁহার ঘোর বিশ্বাস। সকাম উপাসক, দৈববল ভিন্ন কার্য্যসিদ্ধির কোন উপায় নাই বলিয়া, সেই বলের জন্য একান্ত ভক্তি-সহকারে প্রার্থনা করেন। প্রাচীনকালে এই জন্য নানা যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান ছিল। পুত্রেষ্টি-যাগ আর কিছুই নহে,—যে পুত্র বিনা ধর্ম্মকর্ম্ম হয় না, সেই ধর্ম্মকর্ম্মের নিদানস্বরূপ সন্তান-কামনায় যজ্ঞ গৃহীত হইত। গৃহীত হইত কখন? যখন সমস্ত পুরুষকার বিফল হইয়াছে। পুরুষকার বিফল বলিয়া দৈববলের প্রার্থনা। ঈশ্বরেরই কার্য্যের জন্য দৈববলের প্রার্থনা। ঈশ্বরপ্রাণগত হিন্দুর যাগযজ্ঞাদি সকাম হইয়াও নিষ্কামোন্মুখ বলিতে হইবে। হিন্দুউপাসক, দেবপূজা শুধু অন্তরে করেন না, বাহ্য অনুষ্ঠান দ্বারাও তাহা সম্পন্ন করেন। বাহ্যানুষ্ঠান দ্বারা সম্পন্ন করাতে পূজা সামাজিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে স্থলে সমুদায়ই বাহ্যানুষ্ঠান ও সাত্ত্বিক ক্রিয়া-কলাপ, সে স্থলে কি ঈশ্বর শূন্যময় থাকিবেন? ঈশ্বর তো অন্তরেই সমস্ত শক্তির কর্ত্তৃত্বরূপে বিরাজিত। সেই কর্ত্তৃত্বরূপেই

তাঁহার মহিমার বিরাট বিকাশ। তাই হিন্দু তাঁহাকে সর্ব্ব ব্যাপারের মূল-কর্ত্তৃত্বশক্তিরূপে মূর্ত্তিমান্ করিয়া সমুদায় বাহ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে, সমুদায় ভক্তিময় শোভাসম্পন্ন আয়োজন ও উপহারের মধ্যে স্থাপিত করেন। স্থাপিত করিয়া সমস্ত ভক্তির অনুষ্ঠান তাঁহাতে সমর্পণ করেন। এতদপেক্ষা ভক্তির বিরাট বিকাশ আর কি আছে? হৃদয়োৎসর্গের এই বাহ্য অবয়ব। হিন্দু যাহা দেবতাকে উৎসর্গ করেন, তাহা আর গ্রহণ করেন না— তাহা সম্পূর্ণ দেবভোগ্য। হিন্দুর দেবোৎসর্গে এই আত্মত্যাগের শিক্ষা। এই আত্মত্যাগ সকামকে ক্রমে নিষ্কামে লইয়া যায়। আবার বলি, সাকার ঈশ্বরোপাসনা যোগের এক অঙ্গ মাত্র।

এই জন্য পূজার সামাজিক ফল, প্রভূত হইয়াছে। হিন্দুসমাজ, এই পূজায় মত্ত হইয়াছে। যে ব্যক্তির পূজা, শুধু সেই যে ভক্তি-পূর্ণ এমত নহে; তৎসংসৃষ্ট সমস্ত লোকই ভক্তিরসার্দ্র,—পরিবার-মণ্ডলী পূজায় মত্ত। শুধু পরিবারমণ্ডলী নহে; যে জনপদে, যে গ্রামে পূজা, সেই গ্রাম শুদ্ধ সবাই পূজায় আকৃষ্ট ও ভক্তিতে উল্লসিত। যত দিন পূজা থাকিবে, তত দিন তাহাদের আমোদ-প্রমোদ ও বিলাস, সেই পূজা লইয়া। এরূপ সাত্ত্বিক অনুষ্ঠান ও সামাজিক ব্যাপার কি সামান্য ব্যাপার? এ ব্যাপার যে সমগ্র সমাজকে ভক্তির টানে আকর্ষণ করে। এই দেব-পূজা ও বারব্রতে হিন্দুনারী একান্তমনে কেমন ব্যতিব্যস্ত, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে।

এই দেবপূজা ও প্রতিমা-প্রতিষ্ঠা আছে বলিয়া হিন্দুর দেবমন্দির ও তীর্থস্থান সকল কেমন সামাজিক সাত্ত্বিক ভাবের উদ্বোধন করিয়া থাকে, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং

হিন্দুর প্রতিমা-পূজার ফল, শুদ্ধ ব্যক্তিগত নহে। তাহা সর্ব্ব-সমাজে শুভপ্রদ হইয়া থাকে। প্রতিষ্ঠিত-দেবমন্দির-সমস্ত সর্ব্ব-সমাজকে চিরদিন ভক্তি-পথে আনিতেছে। জনসমাজের মধ্যে যাহাদের ভক্তিভাব স্বভাবতঃই প্রবলা, তাহারা সেই ভক্তির অনুবর্ত্তন করিয়া ক্রমে মুক্তিপথের পথিক হইতে থাকে। সমাজের যথায় তথায় দেবতা প্রতিষ্ঠিত থাকাতে লোকের মনে সর্ব্বদা দেবভয় জাগরূক থাকে, এবং তজ্জন্য পাপপথ হইতে লোকে বিরত হইয়া থাকে। পাপের শাসন ও ভক্তির উদ্রেকের জন্য হিন্দুর ধর্ম্মশিক্ষা ও ধর্ম্মভক্তির উদ্রেক, শুধু যে গৃহে হয়, শুধু যে পরিবারমণ্ডলে হয়, এমত নহে; সামাজিক প্রতিমা-পূজানুষ্ঠানেও সেই শিক্ষা ও ভক্তির উন্নতিসাধন হয়। হিন্দু-সমাজ সপ্ত শত বৎসর ধরিয়া যাবনিক শাসনে রহিয়াছে; যাবনিক ও ম্লেচ্ছশিক্ষার এবং সংস্কারের অধীন হইয়াছে, তথাপি তাহার হিন্দুত্ব যায় নাই। সে হিন্দুত্ব কিসে রক্ষিত? ইংরাজী-শিক্ষিত হিন্দুরা আজি কোন্ শক্তি-প্রভাবে হিন্দু? এই পারিবারিক ও সামাজিক প্রতিমা-পূজার ভক্তিমূলীয় অনুষ্ঠান কি তাহার অন্যতর কারণ নহে? যে শক্তিপ্রভাবে আমরা চিরকাল রক্ষিত হইয়াছি, আজিও সেই সামাজিক ও পারিবারিক সাত্ত্বিক অনুষ্ঠান দ্বারা আমরা নিশ্চয় হিন্দুধর্ম্মে রক্ষিত ও অধিষ্ঠিত হইয়া আছি। আমাদের অণুমাত্র ধর্ম্মশিক্ষা নাই, তথাপি এই ধর্ম্মানুষ্ঠান সকল আমাদিগকে হিন্দু করিয়া রাখিয়াছে। আমরা তাহারই অনুবর্ত্তী হইয়া ক্রমশঃ হিন্দুধর্ম্মে অগ্রসর হই, এবং বয়োবৃদ্ধি-সহকারে ধর্ম্মতত্ত্বের পারমার্থিক রসে নিমগ্ন হই।

বাঙ্গালী-হিন্দুর প্রতিমা-পূজা কি শুদ্ধ ভক্তির বিকাশ? শুধু

ভক্তিতে মানব, দেবোপম হয় না। হিন্দুর দেবতা প্রেমময়, হিন্দুর দেবতা দয়াময়। সৃষ্টি লীলাময় প্রেম-ব্যাপার; স্থিতি পালনময় রক্ষাকার্য্য; লয় শিবময় মঙ্গলের জন্য। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর একত্র জগতে বিদ্যমান বলিয়া এই সংসার-স্রোত চলিতেছে। পুরুষ-প্রকৃতি পরস্পর আসক্ত হইয়া সংসারে বিদ্যমান। সেই আসক্তিই পূর্ণ-প্রেম, তাহাই শিবময়ী প্রকৃতি-শক্তি। সেই শিবময়ী প্রকৃতি মহামায়া। সেই শিবময়ী শক্তির পূজা কি শুদ্ধ ভক্তিতে সমাপ্ত হইতে পারে? হৃদয়ের সমস্ত দেবভাবের বিকাশ না করিলে, প্রেম ও দয়াময়ীর পূজা হইতে পারে না। শুদ্ধ ভক্তি-পুষ্পে তাঁহার পূজা নিঃশেষিত হইতে পারে না। ভক্তির স্ফূর্ত্তি যেমন আবশ্যক, দয়া ও প্রেমেরও স্ফূর্ত্তি তেমনই আবশ্যক। এজন্য বাঙ্গালী সমুদয় হৃদয় দিয়া দেবতাকে পূজা করিতে চাহেন। বাঙ্গালী প্রেমপূরিত হৃদয়ে, শত্রু, মিত্র, সুহৃৎ, ভদ্র, ইতর, আত্মীয়, কুটুম্ব, প্রতিবেশী গ্রামবাসী সকলকে আহ্বান করিয়া পূজা করেন। হৃদয় বিস্তৃত করিয়া একদা প্রেমময়ের পূজায় প্রমত্ত হন। সকলের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া প্রেমময়ের পূজায় মাতিয়া যান। মিলিয়া মিশিয়া একত্র পান আহার করিয়া প্রেমামোদে মত্ত হন। প্রেমপ্রতিমা দর্শনের জন্য পূজায় সকলকে নিমন্ত্রণ করেন। সকলকে একদা প্রেমময়ীর ক্রোড়ে স্থাপন জন্য নিমন্ত্রণ করেন। প্রেমময় মাতৃক্রোড়ে আসিবার জন্য যাহার যাহা সাধ্য, তিনি তাহা মাতাকে উপহার দেন। সেই উপহারে হৃদয়ের ধন, বিশ্বজননীকে অর্পণ করেন। হিন্দু রিক্ত হস্তে দেব দর্শন করেন না। দর্শন করিয়া প্রেমময়ীর উৎসব ব্যাপারে মত্ত হইতে যান। এ ব্যবস্থা বড় সুন্দর ব্যবস্থা।

বাঙ্গালীর প্রতিমা-পূজা সমাজের প্রীতিস্ফূর্ত্তির ব্যাপার। তাহাতে শত্রুমিত্র মিলিত হয়; প্রেমে বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন আসিয়া মিলিত হয়। একত্র পান ভোজন ও আনন্দ-উৎসব করিয়া প্রতিমা-পূজায় প্রেম প্রসারিত হয়।

শুদ্ধ এই প্রেমের ব্যাপারেই পূজার নিঃশেষ নহে। যিনি দয়াময় দীনদয়াল, যিনি করুণাময়ী প্রতুলকর্ত্রী, তাঁহার পূজা কি শুদ্ধ ভক্তি ও প্রেমে সম্পন্ন হইতে পারে? সে পূজায় দয়ারও স্ফূর্ত্তি চাই। দয়ার বিকাশে,—দয়ার উপহারে দয়াময়ীর পূজা। তাই বাঙ্গালীর পূজা-বাড়ীতে দীন-দরিদ্রের অন্নসত্র। পূজা-বাড়ীর চারিপার্শ্বস্থ সমস্ত গ্রামের আর্ত্ত ও দীনহীনেরা পূজায় ঢাক-ঢোলের রোলে আহূত হন। ঢাকঢোলের বাদ্য, পূজাতে সকলকে আহ্বানের জন্য। পূজা পাঁচ জনকে লইয়া, পূজা সেই রবাহূত দীন-দরিদ্র জনগণকে লইয়া। দয়াময়ী যেন দীন-দরিদ্রদিগকে দেখিয়া হাসিতে থাকেন। চণ্ডীমণ্ডপ আলো করেন। তাঁহার চারি দিকে ভক্তির উৎসর্গ ও নৈবেদ্য। প্রেমপূজায় সমগ্র ভদ্রাভদ্র, শত্রু, মিত্র, জনগণের সমাগম; সম্মুখে দীনদরিদ্রগণ তাঁহারই মুখপানে চাহিয়া প্রফুল্ল। অন্ন, পান ও দান-লাভের জন্য সবাই উল্লাসে উল্লসিত। কেবল ভোজন, পান, দান, ধ্যান ও উৎসব। দীন-দরিদ্রের ভোজন, পান ও দানে, বাঙ্গালীর পূজা সম্পন্ন হয়। সকলেরই পরিতৃপ্তি নহিলে, দেবপূজা সম্পূর্ণ নহে। সর্ব্বজীব আনন্দিত না হইলে, আনন্দময়ীর পূজা কি? ভক্তি, প্রীতি ও দয়া—এই ত্রিধারায় হৃদয়স্রোত প্রবাহিত না হইলে, দেব-সাগর পরিপূর্ণ হয় না। সমস্ত জগৎ ও জনসমাজের ভক্তি, প্রেম ও দয়ার বিস্তার না হইলে, দেবপূজা সম্পন্ন হইতে পারে না।

বাঙ্গালীর প্রতিমা-পূজায় এই ত্রিধারা মিলিত হইয়া একদা দেবাধিষ্ঠিত স্থানকে তীর্থস্থান করিয়া দেয়। সেই তীর্থধামের পরিত্রময় ত্রিধারা-মিলিত স্রোতে বঙ্গসমাজ নিমগ্ন হইয়া একদা জীবনকে পূত ও চরিতার্থ করে। যেখানে এই ত্রিধারা সেই-খানেই হিন্দুর তীর্থস্থান। বঙ্গদেশ, নানাবিধ দেবপ্রতিমার পূজা-পার্ব্বণ-ব্রতাদিতে সর্ব্বদা পরিপূত হইয়া সুন্দর পুণ্যক্ষেত্র তীর্থধাম হইয়া রহিয়াছে। চারি দিকে প্রকৃতি-সুন্দরীর আনন্দ, দেবতার আনন্দ, মানব-সমাজের আনন্দ, পশুপক্ষীর আনন্দ, সর্ব্বভূতের আনন্দ, একত্র হইয়া বঙ্গদেশকে মহা আনন্দধামে পরিণত করিয়াছে। বঙ্গদেশ কবিত্বময়,—কবির লীলাময় ক্ষেত্র। কবি, সেই রমণীয় দেশে কবিত্বপূর্ণ প্রতিমা-পূজার প্রতিষ্ঠা করিয়া জনসমাজের হৃদয়-কাব্যকে সহস্রভাবে বিকসিত করিয়াছেন। অথবা কেবল বঙ্গদেশীয় কবিত্বপূর্ণ জনসমাজই প্রতিমা-পূজার সম্যক্ পারমার্থিক রসাস্বাদনের সম্ভোগী হইয়াছে। বঙ্গবাসিগণ, কবির হৃদয়ে ধন-ধান্যপূর্ণ স্বদেশের শ্যামল সুদৃশ্য মাঝে পরম রমণীয় দেবমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া হৃদয়স্থ বৃন্দাবনের রাস-লীলা-প্রতিবিম্বিত বিমল রমণানন্দে বিভোর হইয়া আছেন।

শরতে।
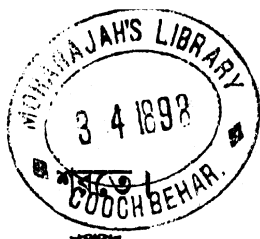
আগমনী।

বেদান্তবাদী যথার্থই বলিয়াছেন, এ সংসার মায়াময়। মায়াময় হিন্দুর সংসার ও পরিবারমণ্ডলী। যে পরিবার-পতি সংসার পাতিয়াছেন, চারিদিকেই তাঁহার মায়া—পিতা মাতা, ভাই, ভগিনী, পুত্র কলত্র,–সকলই মায়াময়। বৃদ্ধ পিতাকে হিন্দু চক্ষুর অন্তরাল করিতে পারেন না; মাতার মধুর বাক্য শুনিলে তাঁহার হৃদয় জুড়াইয়া যায়। হিন্দুর জায়া তাঁহার প্রাণসমা প্রিয়তমা। সবাই তাঁহার হৃদয়-বন্ধনে গ্রথিত—পিতামাতা ভক্তি ও প্রেমে গ্রথিত, জায়া প্রণয়-বন্ধনে আবদ্ধা। যাঁহারা স্নেহসূত্রে গ্রথিত, সেই পুত্রগণ মায়ার পুত্তলী। হিন্দুর পুত্র স্নেহরসে মাথা, কিন্তু পুত্র অপেক্ষা কন্যা বুঝি সর্ব্বাপেক্ষা মায়াবিনী। পুত্র পালনীয়, শাসনীয়; কন্যা পালনীয়া, শিক্ষণীয়া, উভয়ই। পুত্র অপেক্ষা কন্যার হৃদয় আরও কোমল। সেই কোমল-হৃদয়ে কন্যা শিশুকালে জনক জননীকে একেবারে মোহিত করিয়া রাখে। কন্যার আচরণ, ব্যবহার তাহাদের একান্ত মনোহরণ করে! তাহারা জানে, কন্যা দু দিন পরে পরগৃহে যাইবে, তাই সে তত মায়াবিনী হয়।

হিন্দুর সংসার যেমন মায়াময়, তেমনি ধর্ম্মময়। সেকালে আর্য্যেরা গৃহী হইতেন, কেবল ধর্ম্মসাধনার জন্য। তাঁহাদের গৃহ অতিথির আশ্রয়, গুরুজনের সেবাস্থান, দেবতার অর্চ্চনালয়

এবং ধর্ম্মের কর্ম্মক্ষেত্র। সেকালে ব্রহ্মচারী সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিতেন কেবল ধর্ম্মভাবের পরিণতি সাধন করিবার নিমিত্ত। গৃহধামে ধর্ম্মভাবের সম্যক্ পরিপাক না হইলে সংসারী তৃতীয় আশ্রমে যাইবার উপযোগী হইতেন না। সংসারের কর্ম্মক্ষেত্র স্বর্গের দ্বারস্বরূপ ছিল। হিন্দুমতে সংসারধর্ম্মে পরিণত না হইলে স্বর্গধাম হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে হয়। তাই সেকালে হিন্দুর গৃহ দেবতার অধিষ্ঠান-ভূমি ছিল।

গৃহী কি করিতেন? তিনি পরিবার মধ্যে মায়ায় পরিবৃত হইয়া কি চিরকাল থাকিতেন? তিনি জানিতেন গৃহপুর তাঁহার গন্তব্য স্থলে যাইবার পথ মাত্র। তাঁহার যাইবার স্থান মায়াময় গৃহের অনেক দূরে। সেই স্থানে যাইবার জন্য তিনি গৃহধামে প্রস্তুত হইতেন। যে মায়ায় পুত্র পরিবারগণ আবদ্ধ, সেই মায়াকে তিনি সংসার হইতে অপনীত করিয়া ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরে মন নিয়োজিত করিতেন। নিত্য দেবসেবায় ঈশ্বরানুরাগ ও একাগ্রতা লাভ করিতেন। তিনি পিতৃভক্তিতে সর্ব্বপালন-কর্ত্তাকে সর্ব্বোপরি পিতৃরূপে দেখিতেন। জননীর উপর বিশ্বজননীকে পূজা করিতেন। তদপেক্ষা আরও নিকট ভাবের অধিকারী হইলে, যশোদা যেরূপ ব্রজদুলালকে একবারও চক্ষুহারা করিতে পারিতেন না, তদ্রূপ নিকট-ভাবে ইষ্টদেবকে তিনি পুত্রবৎ দেখিতেন। পুত্রবাৎসল্য তখন ঈশ্বরে গিয়া স্থাপিত হইত। যে স্নেহে লোকে পুত্রকে ভালবাসে, সেই স্নেহে আর্য্যঋষি ঈশ্বরকে ভাল বাসিতেন। তাঁহার ভালবাসা তদপেক্ষাও ঘনতর হইত। যে বাৎসল্য কন্যাতে স্থাপিত, সেই বাৎসল্য-রসে নিমগ্ন হইয়া ঋষি ঈশ্বরকে আরও ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখিতেন। তখন তাঁহার যশোদার

ভাব গিয়া মেনকার বাৎসল্যোদয় হইয়াছে। যে বাৎসল্যোদয়ে পাষাণীও গলিয়া যায়, সেই বাৎসল্যে ঋষি ইষ্টদেবকে হৃদয়-পুরী মধ্যে স্থাপিত করিতেন। তাঁহাকে ষোড়শোপচারে পূজা করিতেন, ক্ষীর ননী খাওয়াইতেন, আদরে হৃদয়ে বসাইতেন, এবং তাঁহাকে সর্ব্বস্ব দিয়াও যেন তৃপ্ত হইতেন না। মাতা যেমন পুত্রকেও লুকাইয়া কন্যার স্নেহ-পাশে বদ্ধ হইয়া তাহার তৃপ্ত্যর্থ নিজ গোপনীয় সমস্ত ধন বিতরণ করেন, আর্য্যঋষি তেমনই ভাবে ঈশ্বরকে হৃদয় খুলিয়া সমস্ত ভালবাসা অর্পণ করিতেন। এই প্রগাঢ় অনুরাগ আগমনীতে প্রকটিত।

কন্যার প্রতি মাতার যত দূর হৃদয়ের টান, তত দূর টানে পূর্ব্বতন ঈশ্বরপরায়ণ আর্য্যগণ ব্রহ্মানুরাগী ছিলেন। সাত্বিক বাৎসল্যরসে নিমগ্ন হইয়া দেবতাকে পুত্রবৎ স্নেহ, পুত্রবৎ কেন, মাতা যেমন কন্যাকে স্নেহ করেন ততই স্নেহে দেবতাকে হৃদয়-মন্দিরে অধিষ্ঠিত করিতেন। কিন্তু শুদ্ধ এই কথা বলিলেই তাঁহাদের সাত্বিক বাৎসল্যভাবের সম্যক্ পরিচয় হয় না। যদি বল, পুত্র অপেক্ষা কন্যার প্রতি মাতার অধিক টান কেন হয়? তাহার একটি কারণ এই, কন্যা সর্ব্বদা পরগৃহেই থাকেন। চক্ষের অন্তরালে থাকাতে কন্যার জন্য মাতা অধিকতর ব্যাকুলা। তিনি কন্যার নিমিত্ত যেন সতত অন্যমনস্কা। তিনি কন্যার জন্য যখন তখন ভাবিতেছেন। কাতরতায় তিনি মধ্যে মধ্যে কন্যাকে নিজ পার্শ্বে আনিয়া বিশেষরূপে যত্ন করেন। যাহাকে এত দিন যত্ন করিতে পারেন নাই, তাহাকে পাইয়া মনের সাধে যত্ন করেন। সেই যত্নে কন্যা মাতার বিশেষ আদরিণী। কন্যারও হৃদয়-ব্যথা উথলিয়া উঠে। তিনি শ্বশুর-গৃহের সমস্ত দুঃখ ও

কষ্ট মাতাকে জানান। দুজনে এক সঙ্গে বসিয়া অশ্রুজলে চক্ষু ভাসাইয়া দেন। তাহাতে তাহাদের হৃদয়-ব্যথা আরও বর্দ্ধিত হয়। কন্যা, মাতার আরও নিকটবর্ত্তিনী হন। আবার যখন মাতৃক্রোড় হইতে ছিন্না হইয়া সেই কন্যাকে শ্বশুরালয়ে লইয়া যাওয়া হয়, তখন মাতার সমুদয় হৃদয়-ব্যথা উথলিয়া উঠে। সেই হৃদয়-ব্যথায় মাতা কাঁদেন, তাঁহার ক্রন্দন দেখিয়া কন্যারও ক্রন্দন আইসে। এইরূপে কন্যার প্রতি মাতার টান চিরদিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে। উমার প্রতি মেনকার টান তদ্রূপ চির-দিনের টান। তাহা চিরদিন বর্দ্ধিত হইয়াছে। যাঁহারা একান্ত ঈশ্বর-পরায়ণ, তাঁহাদের ব্রহ্মনিষ্ঠা তদ্রূপ চিরদিন বর্দ্ধিতা হইলে থাকে। একবার তাঁহাদের হৃদয় হইতে ব্রহ্ম অন্তর্হিত হইতে তাঁহারা কাতর হন। আবার ব্রহ্মকে লাভ করিয়া দ্বিগুণতর যত্নে তাঁহাকে হৃদয়-কন্দরে স্থাপন করেন।

কিন্তু কন্যার প্রতি মাতার টান সর্ব্বস্থলে সমান প্রকাশিত হয় না। কন্যার অবস্থানুসারে তাহা প্রকটিত হয়। কন্যার অবস্থা ভাল হইলে মাতার টান কিছু কমে না, তাহা কেবল সকল সময়ে বাহ্য কাতরতায় তত প্রকাশিত হয় না। কিন্তু যে স্থলে কন্যার অবস্থা তত সুখের নহে, সে স্থলে মাতার কাতরতা দেখে কে ? তাঁহার কাতরতা যেন দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়া বাহিরে দেখা দেয়। কন্যা রাজরাণী হইলে মাতার যে একেবারে কাত-রতা নাই এমত নহে, তবে তাঁহার হৃদয়-ব্যথার অনেক দূর শান্তি হয়। কন্যা রাজরাণী হইলে যে পরিমাণে সেই ব্যথার শান্তি হয়, কন্যা ভিখারিণী হইলে তাঁহার ততোধিক অশান্তি ঘটে ; কাতরতার আর ইয়ত্তা থাকে না। মাতা অহরহঃ অশ্রু-

জলে ভাসিতে থাকেন। উমার জন্য মেনকার কাতরতা ততদূর অশান্ত ছিল। সেই কাতরতায় পাষাণও গলিয়া গিয়াছিল। গিরিরাজ গলিয়া গিয়া উমাকে আনিলেন। ব্রহ্মের জন্য মানব-হৃদয়ের কাতরতা এইরূপ হওয়া চাই। যে ঈশ্বরপরায়ণতা তত দূর কাতর নহে, সে ঈশ্বরপরায়ণতার সম্যক্ পরিণতি হয় নাই। ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তির নিকটস্থ হইলে পাষণ্ডেরও ভক্তি সঞ্চার হওয়া চাই। এই রাগই প্রকৃত ঈশ্বরানুরাগ। এই রাগের ছবি আগমনীতে দেওয়া আছে।

দেবানুভব-স্মৃতি।

সেই বসন্তকালে দেবপরায়ণ বঙ্গবাসী একবার দুর্গাপূজার উৎসবে মাতিয়াছিলেন। সে উৎসব মনে অনেক দিন জাগরিত ছিল। কিন্তু সে উৎসবের তরঙ্গ মনে মনে ক্রমে বিলীন হইতে লাগিল। তখন সাত্ত্বিক বঙ্গবাসীর হৃদয় দেববিরহে কাতর। তিনি ঈশ্বরের সমস্ত শক্তিরূপ একবার প্রত্যক্ষ প্রতীয়মান করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তরে যে ভগবৎ শক্তি জাজ্বল্যমান, তাহা ভগবতীতে আঁকিয়াছিলেন; ঈশ্বরভক্তের অন্তরে যে দৈবৈশ্বর্য্য জাজ্বল্যমান, তাহা লক্ষ্মীতে দিয়াছিলেন; ভক্তের যে উজ্জ্বল দিব্যজ্ঞান ও পবিত্রতা, তাহা সরস্বতীতে প্রতিফলিত করিয়াছিলেন; ভক্ত-হৃদয়ের যে অদম্য বীরত্ব, যে বীরত্বে সমস্ত পাপাসক্তিরূপ পাপাসুর বিজিত হয়, যে সংযমবীরত্বে রিপুকুল বশীভূত হয়, ভক্ত হৃদয়ের সেই বীরত্ব,—যাহা ভগবৎ শক্তিরই অঙ্গ,—তাহা কার্ত্তিকেয়-মূর্ত্তিতে মূর্ত্তিমান দেখিয়াছিলেন; আর ততদূর বীরত্ব নহিলে কি যোগসিদ্ধি লাভ হয়? ভগবৎ-শক্তি-প্রসূত সেই

সিদ্ধি গণেশের প্রতিমায় অগ্নিবৎ উজ্জ্বল দেখিয়াছিলেন, দেখিয়া তিনি যে ঈশ্বরকে সর্ব্বদা হৃদয়ে প্রত্যক্ষ দেখেন, যাঁহাকে কার্য্যে, অনুষ্ঠানে, ধ্যানে, ধারণায় হৃদয়ে মূর্ত্তিমান করিয়াছেন, সেই দেবার্চ্চনার উৎসবে তিনি একদা যেরূপ মত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহরাগে কত যত্নের সহিত পূজা করিয়াছিলেন, তাহা কি তিনি কখন ভুলিতে পারেন? আবার বঙ্গীয় ভক্ত-হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। ভক্ত সেই দেবমূর্ত্তির স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। মাতা যেরূপ পরগৃহবাসিনী কন্যার স্বপ্ন দেখেন, বঙ্গীয় ভক্ত সেইরূপ দেবস্বপ্নে কাতর হইলেন। কেন তিনি এত দিন দেবতাকে দূরে রাখিয়াছিলেন? আর কি তিনি সে ঈশ্বরকে ধ্যানে আনিতে পারিবেন?

তিনি যে অনেক কষ্টে ভগবৎ-শক্তিকে মূর্ত্তিমতী করিয়াছিলেন। সে সংযম তাঁহার মনে আছে, যে সংযমে রিপু ও ইন্দ্রিয়দমন হইয়াছিল। সেই অগ্নি তেজ তাঁহার স্মরণ হইল, যে অগ্নিতেজে তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, সেই তত্ত্বজ্ঞান তাঁহার স্মরণ হইল, যে তত্ত্বজ্ঞানে তিনি পরম পবিত্রতা লাভ করিয়া দিব্যালোকে ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ দেখিয়াছিলেন; সেই হৃদয়-পূর্ণতা তাঁহার স্মরণ হইল, যে পূর্ণতায় তিনি সমস্ত ভগবৎ বিভূতি ও ঐশ্বর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন; এই সমস্ত স্মরণ করিয়া তিনি সমগ্র ভগবৎ-শক্তি হৃদয়ে প্রত্যক্ষ দেখিতে লাগিলেন। এই কৈবল্যদায়িনী ভগবৎ-শক্তিকে তিনি স্বপ্নে প্রতীয়মান দেখিতে লাগিলেন। অনেক দিনের বিরহে ভক্তি এইরূপে প্রকটিত হইল। বিরহে ভক্তি এইরূপ স্বপ্নময়ী হইয়া উঠে। কৃষ্ণবিরহে রাধিকা শতবৎসর ধরিয়া শ্যামস্বপ্নে জীবিতা

ছিলেন। মেনকাও স্বপ্নময়ী ভক্তি। বিরহেই ভক্তির প্রকৃত রূপ প্রকটিত হয়। তাই পরমভক্ত নারদ বলিয়াছিলেন ;—

"তদর্পিতাখিলাচারতাতদ্বিস্মরণে পরমব্যাকুলতেতি"

নিজকৃত সমস্ত কর্ম্ম ভগবানে অর্পণ এবং তাঁহাকে বিস্মৃত হইলে যে চিত্তের একান্ত ব্যাকুলতা জন্মে, তাহারই নাম ভক্তি।

বিরহেই অনুরাগের প্রকোপ। অনুরাগের প্রকোপ মিলনের জন্য। বিরহেই ভক্তির পরিপুষ্টি সাধন হয়।

ভক্তিতে দেবাবির্ভাব।

ভক্তের কাছে যেমন দেবতার আদর, তেমনি দেবতার কাছে ভক্তির আদর। ভক্তি যেমন দেবতার প্রিয়, ততদূর প্রিয় আর কিছুই নাই। দেবী যে ভক্তের নিকট বসন্তোৎসবে উদয় হইয়াছিলেন, তাঁহার ভক্তি ছয় মাস পরে আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। বর্দ্ধিতা ভক্তির নিকট চিরযৌবনা উমা তাই কন্যাভাব ধরিলেন। সন্তান বৃদ্ধ হইলে মাতা যেমন কন্যাস্থানীয় হয়েন, বৃদ্ধা ভক্তির নিকট, উমা সেইরূপ কন্যাভাবে আসিলেন। সন্তানের পালনীয়া মাতা, সন্তানকে যে ভাবে দেখেন, আজি উমা বৃদ্ধ ভক্তকে সেই ভাবে দেখিতেছেন। ভক্তও সেই জন্য বাৎসল্যরসে দেবীকে গৃহে আনিতেছেন। একদিন মাতৃভক্তিতে উদ্বোধিত হইয়া যাঁহাকে পূজা করিয়াছেন, আজি কন্যা-বাৎসল্যে তাঁহাকে আদরে হৃদয়মন্দিরে আহ্বান করিতেছেন। এ আহ্বান অতি মধুর, সঙ্গীতের ন্যায় মধুর। সেই মধুর সঙ্গীত-রবে আগমনী ধ্বনিত হয়। আগমনী হৃদয়ের আহ্বানগীতি—দেবীকে

ভক্তহৃদয় আহ্বান করিতেছে। দেবীও ভক্তের হৃদয়ে আকৃষ্ট হইয়াছেন। এই পরস্পর-আকর্ষণের মিলন-ছবি দুর্গোৎসব। আগমনী সেই আকর্ষণ-শক্তি। বোধনে ভক্তির উদয়, প্রতিষ্ঠা ও ঘটস্থাপনা; আর মিলনের ফল দশভূজা প্রতিমা। ভক্তি-জগতে এমন এক সময় উপস্থিত হইয়াছিল, যখন ঠিক এইরূপই ঘটিয়াছিল। যাহা একদিন ঘটিয়াছিল, জগতে তাহা অমূল্য নিধি। সে অমূল্য নিধি কি জগৎ ভুলিতে পারে? তাই তাহা প্রতি-বৎসরে ভক্তির উচ্চ আদর্শ বলিয়া প্রতিষ্ঠা করে—পূজা করে। বাস্তবিক এ আদর্শ প্রতিবৎসর নয়ন-ছবিরূপে জাগরূক রাখা আবশ্যক। এ আদর্শ ভক্তির দেবত্ব। দেবত্বের পূজায় সত্ত্বগুণেরই গৌরব-বৃদ্ধি হয়।

পৌরাণিক দেব-তত্ত্ব।

এই উদ্দেশেই কালিকাপুরাণ পৌরাণিক ভাষায় বলিতে-ছেন ;—

"পূর্ব্বকালে স্বায়ম্ভুব মনুর অন্তরে দেবী ভগবতী, দেবগণের হিতের নিমিত্ত দশভুজারূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন এইরূপ ইতিবৃত্ত আছে। উহা মনুষ্যদিগের ত্রেতাযুগের আদিতে জগতের হিতের নিমিত্ত সংঘটিত হয়। পূর্ব্বকালে যেরূপ ঘটিয়াছিল, প্রতিকল্পেই ঘটিয়া থাকে। প্রতি কল্পেই দৈত্যদিগের নাশের নিমিত্ত দেবী স্বয়ং প্রবৃত্ত হন, এবং রাবণ, রাক্ষস ও রামও প্রতি-কল্পে উৎপন্ন হন। প্রতিকল্পে ঐ উভয়ের সেইরূপ যুদ্ধ হয়, এবং পূর্ব্বের মত দেবতাদিগের সহিতও রামের সঙ্গ হয়। এইরূপ হাজার হাজার রাম এবং হাজার হাজার রাবণ পূর্ব্বে হইয়া

গিয়াছে, এবং ভবিষ্যতেও হইবে; ভূত ও ভবিষ্যতে দেবীরও এইরূপ প্রবৃত্তি হইবে। সকল দেবগণ কল্পে কল্পে দেবীর পূজা ও স্বসৈন্যের নীরাজন করেন; অতএব মনুষ্যদিগেরও যথাবিধি দেবীর পূজা করা উচিত।”

দেবী কে? এই দেবী-তত্ত্ব ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে উক্ত হইয়াছে;—

“একদা শ্রীকৃষ্ণ গোপরাজ নন্দকে বলিতেছেন, দুর্গা আদিভূতা নারায়ণী শক্তি। আমার ঐ শক্তি সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়কারিণী। আমার ঐ শক্তির প্রভাবেই ব্রহ্মাদি দেবতা সকল বিশ্বসংসার জয় করেন। ঐ শক্তি হইতেই এই সংসারের উৎপত্তি। আমি জগতের সংহারের নিমিত্ত দেব দেব মহাদেবকে ঐ শক্তি প্রদান করিয়াছি। আমার ঐ শক্তি দয়া, নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃপ্তি, তৃষ্ণা, শ্রদ্ধা, ক্ষমা, ধৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি ও লজ্জাস্বরূপিণী। উনিই গোলকে রাধিকা, বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী, কৈলাসে সতী, এবং হিমালয়ে পার্ব্বতী। উনিই সরস্বতী ও সাবিত্রী। বহ্নিতে দাহিকাশক্তি, ভাস্করে প্রভাশক্তি, পূর্ণচন্দ্রে শোভাশক্তি, জলে শৈত্যশক্তি, শস্যে প্রসূতিশক্তি, ধরণীতে ধারণাশক্তি, ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণ্যশক্তি, দেবগণে দেবশক্তি, তপস্বীতে তপস্যাশক্তি, সকলই উনি। আমার ঐ শক্তি গৃহিগণের গৃহদেবতা, মুক্তের মুক্তিরূপা এবং সাংসারিকের মায়া। আমার ভক্তগণের মধ্যে উনিই ভক্তিদেবীরূপে বিরাজিতা। রাজার রাজলক্ষ্মী, বণিকের লভ্যরূপা, সংসার-সাগরোত্তরণে দুস্তরতারিণী বেদরূপা, শাস্ত্রে ব্যাখ্যা-রূপিণী, সাধুগণের সদ্বুদ্ধিরূপা, মেধাবীতে মেধাস্বরূপা, দাতৃগণে দানরূপা, ক্ষত্রিয়াদিবর্ণে বিপ্রভক্তিরূপা, সাধ্বী স্ত্রীতে পতিভক্তিরূপা, সকলই ঐ শক্তি। এক কথায় আমার দুর্গাশক্তি সর্ব্বশক্তিস্বরূপা।”

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাহা সর্ব্বশক্তির অধিষ্ঠাত্রী শক্তিরূপিণী, তাহাই ভগবতী। এই শক্তির প্রভাব উপলব্ধি করিয়া যখন ভক্ত মস্তক অবনত করেন, তখনই তাঁহার পূজা করেন। যখন সেই দেবশক্তিতে জীব অনুপ্রাণিত হন, তখনই তাঁহার উদ্বোধন হয়।

এক্ষণে রামতত্ত্ব শ্রুতিতে কিরূপ উক্ত হইয়াছে, তাহাই প্রকটিত হইতেছে। "রামশব্দে অদ্বৈত পরমাত্মাকেই বুঝায়, যোগিগণ যে অমূর্ত্ত ব্রহ্মেতে ইন্দ্রিয়-নিরোধ পূর্ব্বক রমণ করেন, তিনিই রাম।"

"রমন্তে যোগিনোঽনন্তে নিত্যানন্দে চিদাত্মনি।"
ইতি রামপদে নাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে॥" শ্রুতি।

অন্যত্র :—

প্রণবের অকার জাগ্রদভিমানী লক্ষ্মণ, উকার স্বপ্নাভিমানী শত্রুঘ্ন, মকার সুষুপ্ত্যভিমানী ভরত, রাম সচ্চিদানন্দস্বরূপ অর্দ্ধ-মাত্রাত্মক নাদ, কারণ, ব্রহ্মই শব্দ; আর শ্রীরামের সান্নিধ্যবশতঃ জগতের আনন্দদায়িনী এবং সর্ব্বপ্রাণীর উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণীভূতা সীতাকে মূল প্রকৃতিরূপা জানিবে, * তিনিই বিন্দু।

---

* বশিষ্ঠদেব বলেন, "অগ্নি ও সোম হইতেই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হইতেছে।" সীতা সেই অগ্নিময়ী প্রকৃতিশক্তি, সুতরাং অগ্নিপরীক্ষায় তাঁহার সেই শক্তিরই পরিচয় ও শেষ হইয়াছে। অগ্নিময়ী সীতা লয়কারিণী; অগ্নি-পরীক্ষাকালে তিনি অগ্নির সহিত মিশিয়া গিয়াছিলেন। তৎপরে সীতা সোমাত্মিকা হইয়া ভগবৎসহবাসে পুত্রপ্রসবিনী হইয়াছিলেন। সোমাত্মিকা সীতা সৃষ্টিকারিণী। তৎপরে, জগতের উপাদানস্বরূপা পৃথিবীতেই মিশিয়া গিয়াছিলেন।

যখন সীতা প্রণবের সহিত অভেদ প্রাপ্ত হয়েন, তখন ব্রহ্মবাদীরা তাঁহাকে প্রকৃতি বলেন। বিন্দু, পরমাণু ও প্রকৃতি, সকলই এক পদার্থ, সকলই সৃষ্টির উপাদান সত্ত্বপদার্থ ব্রহ্ম।

"অকারাক্ষরসম্ভূতঃ সৌমিত্রির্বিশ্বভাবনঃ।
উকারাক্ষরসম্ভূতঃ শত্রুঘ্নস্তৈজসাত্মকঃ॥
প্রজ্ঞাত্মকস্তু ভরতো মকারাক্ষরসম্ভবঃ।
অর্দ্ধমাত্রাত্মকো রামো ব্রহ্মানন্দৈকবিগ্রহঃ॥
শ্রীরামসান্নিধ্যবশাজ্জগদানন্দদায়িনী।
উৎপত্তিস্থিতিসংহারকারিণী সর্ব্বদেহিনাম্॥
সা সীতা ভবতি জ্ঞেয়া মূলপ্রকৃতিসংজ্ঞিতা।
প্রণবত্বাৎ প্রকৃতিরিতি বদন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ॥"

রামতাপনীয়োপনিষদঃ।

শ্রুতিতে যে যোগতত্ত্ব প্রচারিত, রামায়ণে তাহার কাব্য-সৃষ্টি। যোগীর চিত্তাবস্থাই দৈত্য দানব এবং রক্ষঃ পিশাচ। যোগশাস্ত্রে দেখুন, রক্ষঃ এবং দৈত্য দানব কি?

"অন্তঃকরণকে চিত্ত কহে। ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র আর নিরুদ্ধভেদে চিত্তের অবস্থা পঞ্চবিধ। রজোগুণের উদ্রেক হওয়ায় যে অবস্থাতে চিত্ত অস্থির হইয়া সুখদুঃখাদিজনক বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, সেই অবস্থাকে ক্ষিপ্তাবস্থা কহে। তাহাই দৈত্যদানবাদির অবস্থা। যে অবস্থায় তমোগুণের উদ্রিক্ততা-নিবন্ধন কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য-বিচারবিমূঢ় হইয়া ক্রোধাদিবশতঃ চিত্ত সর্ব্বদা বিরুদ্ধ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে মূঢ়াবস্থা কহে। সেই মূঢ়াবস্থাই রক্ষঃ পিশাচের অবস্থা। সত্ত্বগুণের উদ্রেক হইলে চিত্ত দুঃখকর বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া সর্ব্বদা সুখসাধনে প্রবৃত্ত হয়। ঐ কালে চিত্তের বিক্ষিপ্তাবস্থা জন্মে। এই অবস্থা দেবতাদিগের

অবস্থা। সত্ত্বগুণে বিশুদ্ধ হইলে চিত্তের একাগ্রতা ও নিরুদ্ধাবস্থা জন্মে।" *

পাতঞ্জল দর্শন।

বোধন।

সুতরাং প্রতীত হইতেছে, যত দিন ইন্দ্রিয়গণ শাসিত না হয়, তত দিন তমোগুণের প্রাধান্য আছে। দশেন্দ্রিয়রূপী দশানন রাক্ষস। ইন্দ্রিয়লালসা সর্ব্বগ্রাসী রাক্ষসবৎ। সেই রাক্ষস, সত্ত্ব-প্রকৃতিরূপিণী সীতাকে দেবক্রোড় হইতে হরণ করে। সেই দেবত্বে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করাই রামায়ণ ও যোগ। পরমাত্ম-রূপী জীব যখন রাক্ষস-বিজয়ী হয়, তখন সীতার সহিত রামের মিলন হয়। জীব এই বিজয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া একদা যোগমায়া শক্তির আরাধনা করেন। যখনই সেইরূপ আরাধনা করেন, তখনই দুর্গাপূজা হয়। দুর্গাপূজা যোগশক্তির সাধনা। যোগ-সিদ্ধিরূপ ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া যোগী এই সাধনায় প্রবৃত্ত হন। সাধনাই সিদ্ধির কারণ। যে সিদ্ধির ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া যিনি ভগবতীর আরাধনা করেন, ভগবতী তাঁহাকে সেই ফলই প্রদান করেন। কারণ,

---

* শ্রীজয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন। গীতার ষোড়শাধ্যায়ে এই আসুরী ও রাক্ষসী প্রকৃতি বর্ণিত হইয়াছে। সেই আসুরী ও রাক্ষসীপ্রকৃতিকে মূর্ত্তিমতী করিয়া কবিগুরু রামায়ণে তাঁহার সহিত সাত্ত্বিকী প্রকৃতির বিরোধ দেখাইয়াছেন। কাল আসিয়া যখন রামের কালপূর্ণ হইয়াছে, রামকে স্মরণ করাইয়া দিল, তখন জগদাত্মস্বরূপ রাম কারণ-বারিরূপ সরযূতে মিশিয়া জগতের পরমাত্মরূপে অবস্থিতি করিলেন।

যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।

যোগী সেই ফলাভিলাষী হইয়া যখন যোগারূঢ় হয়েন, তখনই তিনি শক্তিতে উদ্বোধিত হন। তাহার চিত্তে যোগশক্তি সঞ্চারিত হয়। সেই শক্তিতে পূর্ণ হইয়া তিনি যোগসাধনায় দৃঢ়ব্রত হয়েন। এই উদ্বোধনই দুর্গোৎসবের বোধন।

ভক্তের ব্যাকুলতা।

গীতায় কথিত হইয়াছে, ফলকামনায় যাঁহারা ঈশ্বরাধনা করেন, তাঁহারা ফলই প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের নিকট ঈশ্বর ফলদাতা মাত্র। যাঁহারা ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া ঈশ্বর পূজা করেন, তাঁহারা আর ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারেন না, ফলই লাভ করেন। যাঁহারা ঈশ্বরকে কামনা করেন, তাঁহারা ঈশ্বরকেই লাভ করেন। কিন্তু ঈশ্বর-কামনা করিতে গেলে অন্য সর্ব্বকামনা পরিত্যাগ করিতে হয়। তত দূর ঈশ্বর-পরায়ণতা বড় সহজ কথা নহে। তাহা ঈশ্বরানুরাগের পরিপূর্ণতা। ঈশ্বরানুরাগ অত্যন্ত প্রবল না হইলে আর জীব সর্ব্বকামনা-পরিত্যাগী হইয়া কেবল ঈশ্বরের অভিলাষী হইতে পারেন না। চিত্তের যখন এই অবস্থা ঘটে, যখন চিত্ত কেবল ঈশ্বরানুরাগী হয়, তখনই চিত্তের একমাত্র স্বপ্ন ঈশ্বর। ঈশ্বরলাভের জন্য তখন চিত্ত একেবারে ব্যাকুল হইয়া পড়ে। সেইরূপ ব্যাকুলতা হয়, যেরূপ ব্যাকুলতায় গিরিরাণী গিরিরাজকে গলাইয়াছিলেন, যেরূপ ব্যাকুলতায় মহারাসে গোপীগণ অচেতন বৃক্ষকেও বলিয়াছিলেন, হে বৃক্ষ! কৃষ্ণ কোথায় গেলেন বলিতে পার? যাহা যাহা সম্মুখে দেখিয়াছিলেন, তাহাকেই অধীরতার সহিত সেই প্রশ্ন বারম্বার করিয়া-

ছিলেন। তাহাদের জ্ঞান ছিল না, কাহাকে তাহারা জিজ্ঞাসা করিতেছে। বাস্তবিক, অত্যন্ত ব্যাকুলতা হইলে চিত্তের ঠিক্ এইরূপ ভাবই ঘটিয়া থাকে। যখন চিত্ত এই অবস্থায় উপনীত হয়, তখনই তাহা গিরিরাণীর স্বরে কাঁদিয়া উঠে। ঈশ্বরলাভের জন্য কাঁদিয়া পাগল হয়।

আগমনীতে এই কাতরতা উচ্ছ্বসিত। ঈশ্বরের জন্য চিত্তের এই কাতরতা কিসের সহিত তুলনা হয়? মাতৃভক্তি এ ব্যাকুলতা নয়; বাৎসল্য বুঝি তাহার তুলনীয়। বহুদিন কৃষ্ণকে না দেখিয়া যশোদা যেরূপ কাতরা হইয়া প্রভাসে গিয়াছিলেন, সেই কাতরতা একদিন যোগীর ঈশ্বরলাভ জন্য ব্যাকুলতার সহিত তুলনীয় হইতে পারে। আর তুলনীয় বহুকাল কন্যাহারা মাতার বাৎসল্য। সে বাৎসল্য উথলিয়া উঠে। এক পলকের বিরহ তাহা বুঝি আর সহ্য করিতে পারে না।

"এনে দাও আমার উমারে।"—

বলিয়া সে বাৎসল্য একেবারে অধীর হইয়া উঠে। এই প্রগাঢ় ঈশ্বরানুরাগের ছবি আগমনীতে প্রতিফলিত। ভক্তির এই ঐকান্তিকতা প্রতিবৎসরে উদ্বোধিত করিবার জন্য আগমনীর গান বঙ্গধামে সঙ্গীত হইয়া থাকে। প্রতিবৎসরেই তাহা নূতন হইয়া আইসে। এমত দেবতুল্য ভগবদ্ভক্তি যদি নূতন বলিয়া না বোধ হইবে, তবে ত জীব নিতান্ত অচেতন। বঙ্গদেশ এত অচেতন নয় যে, এই গানে উদ্বোধিত না হইবে। তাই, যখনই আগমনীর সুর শরতে বঙ্গবাসীর শ্রবণে প্রবেশলাভ করে, তাঁহার হৃদয় তখনই অমনি উথলিয়া উঠে। দুর্গোৎসবের জন্য বঙ্গবাসী অধীর হইতে থাকেন। তাঁহার ভক্তির উৎস

উৎসারিত হইবার জন্য যেন উন্মুখ হয়। তাঁহার হৃদয়ে দুর্গোৎ-সব আইসে। এই ভক্তিভাব কি মধুর!

দেবাবির্ভাবের আনন্দোৎসব।

বঙ্গধামে শরতে আনন্দ উৎসবের সময়। শস্যপ্রধান বঙ্গদেশ আজি ধন ধান্যে পরিপূর্ণ, কৃষি-প্রধান বঙ্গ-ধামের আজি কৃষি-শ্রমের কিছু বিরাম হইয়াছে। বঙ্গ সহস্র নয়নে শস্য-পূর্ণ রজত কাঞ্চনময় প্রসারিত ক্ষেত্রের প্রতি তাকাইয়া পুলকিত হইতেছে। হৃদয়ের আনন্দস্রোত ধীরি ধীরি উঠিতেছে। এ আনন্দ কি মুখে ধরে, না সাধারণ উৎসবে প্রকটিত হইতে চায়। কৃষীবল বঙ্গ-বাসিগণ কত আশার উল্লাসে নাচিতেছে। দুর্গোৎসব বঙ্গজাতির উল্লাস, হাস্যময় শস্যপূর্ণ ক্ষেত্ররাজির প্রতিচ্ছায়া, শরতের বিধু-বদনের শুভ্রময় বিকাশ, মানবপ্রকৃতির উৎসব ও নৃত্য, অন্তর-ধামে বাহ্যজগতের প্রতিবিম্ব, একতন্ত্রে বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতির নৃত্য।

এরূপ নৃত্য স্বাভাবিক ও অনিবার্য্য। যে হৃদয় এ নৃত্যে না নাচিয়া উঠে, সে হৃদয় বড় কঠিন, সে হৃদয় কিছুতেই নাচিয়া উঠে না। হৃদয় যখন এইরূপে নাচিয়া উঠে, তখন কি লইয়া আমোদ করি? বাহ্যজগতে চারিদিকে দেখি, হাস্যময় প্রকৃতির প্রফুল্ল বিকাশ। রজত কাঞ্চন বর্ণে চারিদিকেই মহা-শক্তি হাসিতেছে; হাসিয়া মানবের হৃদয়ে কত আশার সঞ্চার করিয়া দিতেছে। এই হাস্যময় মহাশক্তির পদতলে হৃদয় কৃতজ্ঞ-তারসে আর্দ্র হইয়া আপনা আপনি প্রশস্ত হইতে চায়। অন্তরে আপনা আপনি মহাশক্তির স্রোতে সজীব হইতে থাকে।

অন্তরে শঙ্খ ও ঘণ্টারোল বাজিয়া উঠে। হৃদয় আপনা আপনি এই রোলে উৎসর্গিত হইতে চায়। সাধারণ সর্ব্বজন-হৃদয়ে এক বাজনা বাজিয়া উঠে। অন্তরে দুর্গোৎসব আইসে। মহাশক্তির সকল মূর্ত্তিতে দুর্গোৎসব উদয় হয়। কাঞ্চনময় শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রের বেশে লক্ষ্মীপূজা হৃদয়ে স্বতঃই সমুদ্ভূত হয়। যে কালে হৃদয়ে এমত দেবভাবের সঞ্চার হয়, সেকালে কি বিদ্যাবুদ্ধি-সম্পন্ন, ঐশ্বর্য্যপূর্ণ, বঙ্গদেশ মহাশক্তির পূজার সহিত এক বার সরস্বতী ও লক্ষ্মী পূজা করিবে না? একবার ঐ শুভ ও সিদ্ধিদাতার লোহিত মূর্ত্তির পূজা করিবে না? একবার কুমারের শৌর্য্য ও বীর্য্যবান মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া শৌর্য্যশালী হইতে চাহিবে না? একবার এই শক্তিসমুদায়কে অন্তরে আহ্বান করিয়া, তাঁহাদের ভাবে উদ্বোধিত হইয়া দুঃখ ও সন্তাপজনক প্রমত্ততা ও পাপাসুরকে অন্তঃপুর হইতে বাহির করিয়া দিবে না? প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করা সেই আভ্যন্তরিক ব্যাপারের বাহ্য বিকাশ মাত্র। নহিলে পূজা অন্তরেই হয়। সকলে মিলিয়া একত্র আমোদ ও পূজা করিব বলিয়া প্রতিমা প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক বাহিরে শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া দেয়।

প্রতিমা দেবশক্তিময়ী।

যিনি পৌত্তলিকতা ভাবিয়া দুর্গোৎসবে মিশেন না, তিনি অতি ভ্রান্ত। এদেশে পৌত্তলিকতা নাই, সব হৃদয়ের ব্যাপার। এদেশের পৌত্তলিকতা হৃদয়ের প্রতিরূপ—গুণ গরিমার কর্তৃত্ব-প্রতিষ্ঠা। হিন্দুর পূজা, ধ্যান, স্তব ও স্তুতি যাহা, তাহা সর্ব্ব-জাতির প্রায় সর্ব্ব লোক দিন রাত্রি করিতেছে। গুণের গরিমা,

শক্তির উপাসনা কে না করে? কে না সহস্র মুখে বিদ্যা, জ্ঞান, ও বুদ্ধিমত্তার সমাদর করে? কে না বলিবে "বিদ্যা সর্ব্বত্র পূজ্যতে?" ধন ও ঐশ্বর্য্যের বলে এ পৃথিবীতে কে না বশীভূত হয়? ঐশ্বর্য্যের প্রভাবে কি না সম্পন্ন হইতেছে? এ পৃথিবীতে ধন-বল ও ঐশ্বর্য্য-বল এক একটি মহতী শক্তি। দেবতা সেই শক্তির শক্তি। শক্তি যদি গুণ হয়, দেবতা গুণী। শক্তির যাহা কর্ত্তৃত্ব-শক্তি ও আধার, তাহাই দেবতা। বিদ্যাপ্রভাব যত দূর, ধন ও ঐশ্বর্য্যের প্রভাব কিছু তদপেক্ষা ন্যূন নহে। লোক-সমাজের এই দুইটি মহাবল। ধন-বলে ও বিদ্যাবলেই পৃথিবীতে প্রভুত্ব। যেমন বিদ্যাবান পণ্ডিতের পূজা, তেমনি ধনবান ভাগ্যবানের পূজা। কিন্তু আরও এক শক্তির প্রভাব সমাজে সময়ে সময়ে অনুভূত হয়। সে শক্তি শৌর্য্য। যে শৌর্য্যের প্রভাবে ভারত উঠিয়াছিল, সেই শৌর্য্য,—যে শৌর্য্যের প্রভাবে রোম উঠিয়াছিল সেই শৌর্য্য,—যে শৌর্য্যশূন্য হইয়া ভারত পতিত হইয়াছে, —সেই শৌর্য্য। এই শৌর্য্য-প্রভাবে আজি ইউরোপীয় জাতি পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রধান। তাঁহাদের দুর্দ্দমনীয় সাহস, উৎসাহ ও শৌর্য্যের প্রশংসা কে না করিবে? তাঁহারা যেরূপ অকুতোভয়ে সকল বড় বড় কাজ সমাধা করিতেছেন, সেইরূপ শৌর্য্যের সমাদর ও পূজা কে না করে? শৌর্য্য না থাকিলে দেশ রক্ষা হয় না, জাতি, কুল, মান, কিছুই রক্ষা হয় না। যাহার মান ও আত্মাদর নাই, সে কাপুরুষ ও নিলর্জ্জ। বীরের প্রশংসা ভারত একদিন শতমুখে করিয়াছে। পুরুষকার ভারতের একদিন মহাধন-সম্পত্তি ছিল। সেই পৌরুষ লোক-সমাজের সাক্ষাৎ শক্তি। বীর্য্যবান লোকের প্রভাব লোক-সমাজে অতুল্য। বিদ্যা

ও ঐশ্বর্য্য, একত্র মিলিত হইলে যে মহাশক্তি সমুৎপন্ন হয়, তাহার জয় অনিবার্য্য। তাহার জয় পশু-বলের উপর, তাহার জয় যথেচ্ছাচারিতার উপর, তাহার জয় পাপের উপর। এই ত্রিবিধ শক্তি একত্রিত হইলে আর কোন রিপুর ভয় নাই, সকল শত্রু শাসিত হয়, সকল পাপ বিনষ্ট হয়। যে দেশে, যে লোক-সমাজে এই ত্রিবিধ শক্তি মিলিয়াছে, সকল দেব-দেবতারা, সকল সাধুজন সে দেশের শ্রীবৃদ্ধি সহস্র নয়নে অবলোকন করিতেছেন। এইরূপ শ্রীবৃদ্ধি একদিন ভারতের ছিল। যে দিন ভারতের শ্রীবৃদ্ধি ছিল, সে দিন ভারত সেই শ্রীবৃদ্ধিতে দিব্য চক্ষু পাইয়া দুর্গা-পূজার প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

দুর্গাপূজা আর কিছুই নহে, তাহা মহাশক্তিময়ীর উপাসনা মাত্র। জগতে শক্তি যে কতিপয় রূপে বিকাশ লাভ করিয়াছে, দুর্গাপূজা সেই সকল শক্তির মিলিত পূজা মাত্র। আমরা দুর্গা পূজায় একত্র সর্ব্ববিধ শক্তির পূজা করি; পূজা করি কি ? তাঁহাদের পাদপদ্মে মস্তক অবনত করি। তাঁহাদের স্তুতিগান করি; তাঁহাদের প্রভাব কত দূর, তাহা স্বীকার করি। তাঁহাদের সমাদর করি, তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা করি, তাঁহাদের গুণ-গান করি। ধ্যানে তাঁহাদের পদে প্রাণ মন সমর্পণ করি। দেবতার প্রতিমা-প্রতিষ্ঠা ধ্যানে চিত্তের একাগ্রতা অভ্যাসের নিমিত্ত। যাঁহাকে পূজা করা যায়, তাঁহার মহিমায় চিত্ত পরিপূর্ণ হয়। হিন্দু, দেবত্বলাভের জন্য দেবতার পূজা করেন; চিত্তের একাগ্রতা-লাভের জন্য প্রতিমাপূজা করেন; দেবপদে আত্মোৎসর্গ করিয়া দেহমন পবিত্র করেন।

প্রতিমা-প্রতিষ্ঠা হিন্দুজাতির কবিত্ব ও কল্পনার বিকাশ

মাত্র। যে বিশ্বশক্তি জগৎব্যাপিনী, তাহাই মহাশক্তি, তাহাই শক্তির সমষ্টি। সেই শক্তি শতরূপিণী হইয়া জগতে বিকাশ হইয়াছে। * সেই মহাশক্তিময়ী ভগবতী দুর্গা। সেই শক্তিরই উন্নত বিকাশ চেতনা, চেতনার উন্নত বিকাশ জ্ঞান বিদ্যা ও বুদ্ধি। বুদ্ধিজীবী প্রাণী সমাজের বল,—বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, ঐশ্বর্য্য শৌর্য্য এবং বীর্য্য। সেই বিদ্যা, বুদ্ধি, ঐশ্বর্য্য ও শৌর্য্য সম্বলিত মহাশক্তি পাপ ও যথেচ্ছাচারিতার পশুবল স্বরূপ মহিষাসুরকে শাসনে রাখিয়াছেন। এই ভগবতী, সরস্বতী, লক্ষ্মী, গণেশ ও কার্ত্তিকেয় ; দেবতারা তাঁহাদের পূজাতে প্রসন্ন। যাহাতে পাপের সম্যক্ দমন, যাহাতে অত্যাচার, যথেচ্ছাচার, পশুবলের দমন, তাহাতে কোন্ সাধুব্যক্তি না প্রসন্ন হন। এই দুর্গা-পূজার প্রতিমা-কল্পনাও কবিত্ব। এই হিন্দুজাতির শক্তি-পূজা। এই শক্তি পূজা হিন্দুজাতি একবার করেন না। একবার করিয়া তাঁহাদের হৃদয় পূর্ণ হয় না। বার বার তাঁহারা এই শক্তিপূজা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। একবার সকল শক্তিকে মিলিয়া পূজা

---

* ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের প্রকৃতি-খণ্ডে শক্তিরূপিণী ভগবতীর এইরূপ ব্যুৎপত্তিলভ্যার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। শক্ শব্দ ঐশ্বর্য্য ও তি শব্দ পরাক্রম-বাচক ; যিনি পরাক্রম ও ঐশ্বর্য্যরূপিণী হইয়া তাহা দান করেন, তিনিই শক্তি বলিয়া সংকীর্ত্তিত হয়েন। ভগ শব্দে সমৃদ্ধি, সম্পত্তি ও যশঃ বুঝায়, এই অর্থত্রয়-বিশিষ্টা হইয়া শক্তি ভগবতী নামেও কথিত হইয়াছেন। এই ভগরূপিণী শক্তি দ্বারা সংযুক্ত হইয়াই পরমাত্মা ভগবান্ নামে অভিহিত হয়েন। এই ইচ্ছাময় ভগবান্ দুই ভাগে বিভক্ত হইলে তাঁহার বাম ভাগ স্ত্রী ও দক্ষিণাংশ পুরুষ হইল। এই স্ত্রী, প্রকৃতি-স্বরূপা, সৃষ্টি-স্থিতি লয়-কারিণী ভগবতী। ভগবতীর এই পৌরাণিক ব্যাখ্যা।

করা, আবার তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্র ভাবে পূজা করা। একবার একত্রিত ভাবে মহাশক্তির পূজা, আবার তাঁহার স্বতন্ত্র ভাবে পূজা। সেই শক্তি-পূজা,—কালী, শ্যামা, ও জগদ্ধাত্রী পূজা। লক্ষ্মীকে, স্বরস্বতীকে, কুমারকে আবার স্বতন্ত্র ভাবে হিন্দু পূজা করে, নহিলে তাঁহার তৃপ্তি হয় না। যাঁহারা একত্র সর্ব্বশক্তির পূজা করিতে না পারেন, তাঁহারা স্বতন্ত্রভাবে পূজা করেন। যাঁহার প্রীতি যে শক্তিতে পূজা করিয়া সন্তৃপ্ত হয়, তাঁহার প্রীতি সেই প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করে। এই জন্য বঙ্গ হিন্দু-সমাজে সকল শক্তি-পূজার হুলস্থুল একেবারে পড়িয়া যায়।

মহাশক্তির দুই পার্শ্বে অতি মোহিনী মূর্ত্তিতে চারুহাসিনী সরস্বতী ও লক্ষ্মী শোভা পান কেন? আর শক্তির যে দুই কঠোররূপ, তাঁহারাই বা লক্ষ্মী সরস্বতীর নিম্নদেশে গণেশ ও কার্ত্তিকেয়রূপে নিয়োজিত কেন? এ কল্পনার কবিত্ব কি? রহস্য কি?

লোকসমাজে বিদ্যার দুই মূর্ত্তি। বিদ্যা লোককে মোহিত করে, বিদ্যা লোককে চমকিত ও স্তম্ভিত করে। বিদ্যা যেরূপে মোহিত করে, সেইরূপে বিদ্যা সরস্বতী,—সেই সরস্বতী সুন্দরী, বিমল শ্বেতরূপিণী, বীণাবাদিনী, চারুহাসিনী সরস্বতী। আবার বিদ্যা যখন দার্শনিক পণ্ডিতরূপে গম্ভীরভাবে লোককে বিজ্ঞতার উপদেশ দেন, যে, বিজ্ঞতা সর্ব্বকার্য্যে সিদ্ধিলাভের উপায় স্বরূপ, তখন বিদ্যা গম্ভীর, সিদ্ধিদাতা, বিজ্ঞতা-সম্পন্ন গণপতি। গণপতি গজানন, যে হেতু ঐরাবত বোধ হয়, এককালে মহাজ্ঞানী বলিয়া প্রথিত ছিল। সরস্বতী,—কবিত্ব, বাগ্মিতা, সঙ্গীত প্রভৃতি সুকুমার বিদ্যার মূর্ত্তি, গণেশ—পণ্ডিতের মূর্ত্তি। লোক-

সমাজে সুকুমার বিদ্যার আদর অধিক, অধিক লোক তাহার উপাসক, অধিক লোক বাগ্মিতায় ও কবিত্বে চালিত হয়। রামায়ণ, মহাভারত হিন্দুদের হৃদয় অধিকার করিয়া রহিয়াছে। সিসিরো, ডিমস্থিনিস্, বর্ক, চ্যাটাম দেশশুদ্ধ লোককে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। সঙ্গীতের বলে চালিত হইয়া, সেনাদল রণরঙ্গে প্রাণবিসর্জ্জনেও ধাবিত হইতে পারে। সাধারণ সমাজ কেবল বিদ্যাপ্রভাবেই চালিত হয়। বিদ্যার এই শক্তি অতি প্রধানা। এই শক্তিপ্রভাবে বিদ্যা সর্ব্বজনপ্রিয়। কবি, বাগ্মী, প্রভৃতি বিদ্বজ্জনগণ জগতে সাধারণপূজ্য। দার্শনিক পণ্ডিত তত দূর নহে। বিজ্ঞতা, পাণ্ডিত্য, দর্শনতত্ত্ব কিছু কর্কশ। এই জন্য সরস্বতী দেবীর স্থান, মহাশক্তির পার্শ্বে; কিন্তু গজাননের তাঁহার পরে। বিজ্ঞতা বিঘ্নবিনাশন, গণেশ সর্ব্ববিঘ্নহর ও সর্ব্বসিদ্ধি-দাতা; তজ্জন্য তাঁহার পূজা সর্ব্বাগ্রে। সরস্বতী দেবী; গণেশ পুরুষ ও দেব। যে কথা সরস্বতী ও গণেশসম্বন্ধে বলা হইল, লক্ষ্মী ও কার্ত্তিকেয়-সম্বন্ধে তাহাই বলা যাইতে পারে। লোকসমাজে ধন এবং ঐশ্বর্য্যের যে প্রভুত্ব ও শক্তি, শুদ্ধ শৌর্য্যবলের তত দূর নহে। অধ্যাত্মজগতে কুমার সংযমীর সংযম বল ও বীরত্ব। ঐশ্বর্য্য সুশ্রী ও মনোহর, এজন্য লক্ষ্মী দেবী; কিন্তু পৌরুষ পুরুষোচিত; এজন্য কার্ত্তিকেয় পুরুষ ও দেব। ঐশ্বর্য্য সুবর্ণে মণ্ডিত, এজন্য লক্ষ্মী সুবর্ণবর্ণা। লক্ষ্মী কমলালয়ে অবস্থিত। চমৎকার কবিত্ব! চমৎকার কল্পনা।

চারি বেদ যে জ্ঞানের আধার, সেই গজানন চতুর্ভুজ। দশদিকেই বিস্তৃত যে শক্তি, সেই মহাশক্তি দশভুজা। এই দশভুজা লক্ষ্মী, ও সরস্বতী, এবং কার্ত্তিকেয় ও গণেশজননী—সত্য-

রূপিণী ভগবতী। এই প্রাকৃতিক মহাশক্তি একাধারে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণধারিণী। জন্ম, মৃত্যু ও পালন প্রকৃতির ধর্ম্ম। প্রাণি-জগৎ জন্মিতেছে, পালিত ও ধ্বংস হইতেছে। বিশ্বশক্তি প্রভাবে বিশ্ব আপনি আপনাকে গড়িতেছে, ভাঙ্গিতেছে এবং আপনিই রক্ষিত হইতেছে। * বিশ্বশক্তির এই ত্রিগুণ তাহার অন্তর্নিহিত ভগবৎশক্তি। যে কল্পনা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরে বিকাশপ্রাপ্ত, সেই কল্পনা দুর্গা, জগদ্ধাত্রী ও কালীমূর্ত্তির সৃষ্টিকারিণী।

---

* ইয়োরোপীয় জড় বিজ্ঞানের সহিত হিন্দু অধ্যাত্মবিজ্ঞানের প্রভেদ এই যে, জড় বিজ্ঞান প্রাকৃতিক কার্য্যে শক্তির ক্রিয়ামাত্র দেখিয়া বলে, জগৎ এই শক্তিবলেই চলিতেছে; কিন্তু হিন্দু বলিলেন, এই শক্তির কার্য্য কোথা হইতে উৎপন্ন? তাহা আকস্মিক? (Result of chance) না, সেই শক্তির ক্রিয়ার হেতু আছে? বেদ বলিয়াছেন (ঋগ্বেদ সংহিতা ৮।১০।৮১ এবং শুক্ল যজুর্ব্বেদ সংহিতা ১৭।১৮ ও ১৯) তাহার হেতু আছে। নির্গুণ সত্তা সৃষ্টির কারণরূপ হইয়া নিজেই উপাদান ও নিমিত্ত কারণ হইলেন। এই নিমিত্ত কারণ (Agent) পুরুষ এবং উপাদান কারণ (Patient) প্রকৃতি। সগুণ পুরুষই ঈশ্বর বা সূক্ষ্ম সত্ত্ব এবং প্রকৃতি এই স্থূল জগতের হেতু। সেই বিশ্বকর্ম্মা একাকী অনন্যসহায় হইয়া ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ বাহুদ্বয় এবং অনিত্য পঞ্চভূতরূপ উপাদান কারণ দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। জগৎ কার্য্যের উপাদান কারণ পঞ্চভূত এবং নিমিত্ত-কারণ সৃজ্যমান পদার্থসমূহের ধর্ম্মাধর্ম্ম; যেমন ঘটের নিমিত্ত কারণ—দণ্ড, কুলাল ও কুম্ভকার। উদয়ন উক্ত বেদমন্ত্রকে তাঁহার সৃষ্টিবাদের যুক্তিমূলীয় করিয়া সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝাইয়াছেন। বেদান্ত বলেন, এক নির্গুণসত্তা সগুণ হইয়া মায়াপ্রভাবে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সাধন করিতেছেন। সুতরাং আমাদের মায়িক জ্ঞানে প্রতীত হইতেছে, এই বিশ্ব আপনি স্বধর্ম্মপ্রভাবে আপনাকে গড়িতেছে, ভাঙ্গিতেছে, এবং আপনিই রক্ষিত হইতেছে। বেদ শিক্ষা দিয়াছেন, তাহার মূলে পরমেশ্বর।

মহেশ্বরের হৃদ্দেশ হইতে সংহাররূপিণী কালীমূর্ত্তি সমুদ্ভূতা। প্রলয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সৃষ্টি, এই জন্য পুরুষরূপ মহেশ্বরের জায়া সত্যরূপা ভগবতী, তমোরূপিণী কালী ও রজোরূপিণী জগদ্ধাত্রী। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর একই পুরুষ, জগতের একই মূলতত্ত্ব; সেই মূলতত্ত্ব মায়াপ্রভাবে প্রকৃতিরূপে প্রকটিত হইয়া বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছে। যখন বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছে, তখন তাহা শক্তিরূপে প্রকটিত হইয়াছে। এই মহাপ্রকৃতিশক্তি পরিণামরূপিণী; তাহা ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ, জ্ঞানে সম্পন্ন, এবং শৌর্য্য ও বীর্য্য তাহার অন্তর্নিহিত মহাবল। এই ঐশ্বর্য্যে, জ্ঞানে ও শৌর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া প্রাকৃতিক ব্যভিচাররূপ পাপকে তাহা নিয়তই বিনাশ করিতেছে। সেই পশুবলকে বশ করিয়া জগদ্ধাত্রী সিংহবাহিনী। জগতে পাপ ও ব্যভিচার রক্তবীজের ন্যায় নিয়তই উদয় হইতেছে, নিয়তই কালীরূপিণী শক্তি ধর্ম্ম-অসি করে ধারণ করিয়া তাহা সংহার করিতেছেন। পরিণামরূপিণী প্রকৃতি—উৎপত্তি, পালন ও প্রলয় মূর্ত্তিতে নিয়তই দেখা দিতেছেন, এজন্য বৎসর বৎসর ফিরিয়া আবার দুর্গা, কালী ও জগদ্ধাত্রীর উদয় এবং পূজা হইতেছে। হিন্দু নিত্য দেবসেবা করিয়া আবার নৈমিত্তিক পূজা করেন—বিশেষ কালে যখন ভগবানের বিশেষ মূর্ত্তি জগতে প্রকটিত হয়, সেই বিশেষ মূর্ত্তিতে তখন তাঁহাকে ঘোর ঘটায় পূজা করিয়া নিজ সাত্ত্বিক প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন করেন।

দেব-সাধনা।

হিন্দু-কল্পনা শুদ্ধ প্রকৃতির পরিণাম-রূপিণী শক্তির রূপ ভাবিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। মানুষ আবার এই শক্তির সাধনা করিয়াছে। সাধনায় সিদ্ধ হইয়া প্রকৃতির মহা সৃষ্টির ভিতর মানুষ আবার আর একটি জগৎ গড়িয়াছে। ঐশী বিশ্বশক্তির মহা সৃষ্টি,—প্রকৃতিরাজ্য; মানুষের মহাসৃষ্টি—শিল্পরাজ্য। কিন্তু মানুষ নিজে কিছুই করিতে পারে না, প্রকৃতি-শক্তিকেই তিনি যখন নিজ প্রয়োজনে আনিতে চেষ্টা করেন, তখন প্রকৃতি স্বীয় পালনী শক্তিগুণে মানুষের আয়ত্তীভূত হইয়া অশেষ উপায়ে মানুষকে প্রতিপালন করেন। লোকসমাজ নিজ রক্ষার কারণ প্রকৃতিকে অশেষরূপে শিল্পরূপিণী মূর্ত্তিতে পরিণত করে। প্রকৃতি এইরূপ পরিণত হইলে মানুষ সাধনায় সিদ্ধ হয়। সাধনায় সিদ্ধ পুরুষ প্রকৃতির এই ঐশী শক্তিকে তখন অতি মনোহররূপে সন্দর্শন করেন। এই বিশ্বের যমুনাকূলে সংসাররূপ কদম্বমূলে শক্তি যেন সাধককে বেদরূপ বীণাধ্বনিতে আকর্ষণ করিয়া মোহিত করিতেছেন। দূরে বংশীধ্বনি শুনিতে কত মধুর বোধ হয়। এই ঐশীশক্তি সাধককে যেন সেইরূপ মধুর রবে আকর্ষণ করিতেছেন। সাধক দূর হইতে ঐশীশক্তিকে অনুভব করিতে পারেন মাত্র। এই ঐশীশক্তি কি, তিনি কিছু বুঝিতে পারেন না। কিন্তু এই ঐশীশক্তি বংশীধ্বনির ন্যায় মনোমুগ্ধকরী ও সিদ্ধিদাত্রী। সেই শক্তির স্বরূপ তিনি কিছুই বুঝিতে পারেন না বলিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণবর্ণ রূপে অনুভূত করেন। সেই শক্তির সাধনায় সিদ্ধ হওয়া কঠিন, সুতরাং তাঁহাকে কোন মতে ঋজু

ও সরল ভাবে অনুমান করিতে পারেন না। ত্রিগুণ ভঙ্গ করিয়া নিস্ত্রৈগুণ্য সাধন না করিতে পারিলে এবং মায়াতীত না হইতে পারিলে কখনই তাঁহাকে লাভ করা যায় না, এজন্য সাধক তাঁহাকে ত্রিভঙ্গ মুরারিরূপে কল্পনা করিয়াছেন। সাধকের নিকট তাহা পাপনাশন, তমোরূপ ও মসীময়, এজন্য শ্যামাশক্তি কৃষ্ণমূর্ত্তি। যে শক্তি শ্যামা, সেই শক্তিই শ্যাম। শিবশঙ্করী শ্যামার মনোহর রূপ শ্যাম-বংশীধর। আরাধনারূপিণী রাধার কলঙ্ক-ভঞ্জনের সময় এই শ্যাম শ্যামা রূপে প্রতীত হইয়াছিলেন। কে বলে, আমরা বিভিন্ন শক্তির পূজা করি? জগতে সকলই একমাত্র শক্তিরূপ। জগতে শক্তি ভিন্ন আর কিছুই পূজিত হইতে পারে না। সেই শক্তিই শ্যাম, সেই শক্তিই শ্যামা। সাধক ভেদ্দ কল্পনা ভেদ মাত্র। প্রকৃত সাধকের নিকট সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ ও বিদ্বেষভাব নাই। এই ভেদাভেদ লইয়া জগতে সাধকের (রাধার) যে কলঙ্ক ঘোষণা করে, সে কিছুই জানে না। তাহাকে জ্ঞান দিবার জন্য শ্যাম শ্যামারূপিণী হইয়াছিলেন। সাধক এই শক্তিকে এতদূর আয়ত্ত করিতে পারেন, যে তাহা করতলস্থ আমলকবৎ জ্ঞান হইতে থাকে। যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকে এই শক্তিকে লইয়া যাইতে পারেন। এই শক্তিকে আকাশে তাড়িত বার্ত্তাবহ রূপে নিয়োজিত করিতে পারেন; শত সহস্র যোজনে সংবাদ আনাইতে পাঠাইতে পারেন, এবং শত সহস্র যোজনে আপনার শকটবাহিনী করিতে পারেন। সাধক এই শক্তিকে এত দূর বশীভূত করিতে পারেন। যোগী এই শক্তিকে আপনার যোগসাধনায় নিয়োজিত করেন। কি উপায়ে শক্তি এত বশীভূত হয়? সে উপায়

আরাধনা, সাধনা, ধ্যান, ধারণা, চিন্তা, ভাবনা সহকৃত ভক্তি —সে উপায় গোপাঙ্গনাসহকৃত রাধারূপে প্রকটিত। রাধার বশীভূত শ্রীকৃষ্ণ, সাধনার বশীভূত ঐশীশক্তি। ভক্তির ভগবান। রাই রাজা। কৃষ্ণ রাধার অনুবর্ত্তী দাস, রাধার পদতলে। রাধাতে শ্যাম কেমন অনুরক্ত, যেমন প্রেমপূর্ণ স্বামী—সতীতে অনুরক্ত। কৃষ্ণ—রাধার ক্রীড়নক। রাধার কাছে শ্যাম রমণ-ময়, লীলাময়। কৃষ্ণ রাসবিহারী। এই রাধা কৃষ্ণের রাসলীলায়, সাধকের নিকট ঐশীশক্তির এই লীলাময় মনোহর মূর্ত্তি আমরা সন্দর্শন করি। কখন সন্দর্শন করি? একদিন অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারে কালী মূর্ত্তির পূজা করিয়া, একদিন নবমীর অর্দ্ধ জ্যোৎস্নালোকে জগদ্ধাত্রী পূজা করিয়া, পূর্ণিমার পূর্ণ জ্যোৎস্নায় আর এক দিন রাধার রাস-বিহার দেখি। হৃদয়ে ক্রমে ক্রমে শক্তি-কুসুম ফুটিয়া উঠে। কৃষ্ণ কেমন রাস-বিহারে রাধার নিকট আগমন করিতেছেন, ক্রমে ক্রমে উদয় হইতেছেন, জ্যোৎস্না ফুটিতেছে, আর রাধার রাস-যাত্রা আসিতেছে, পূর্ণিমার পূর্ণবিকাশে রাধার মনে শ্যাম নৃত্য করিতেছেন, এই নৃত্য সন্দর্শন করিবার জন্য, হিন্দু এক দিন কালভয়ঙ্করী কালী-মূর্ত্তি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়াই মনোহর শ্যাম-শশধরের মোহন মূর্ত্তি কল্পনা ও ধারণা করিয়া তবে শান্ত হইলেন; তখন চারুচন্দ্র হাসিতে লাগিল। রাস-বিহারে ফুল ফুটাইলেন। মহাশক্তির ত্রিগুণাত্মিকা কল্পনার পূজা করিয়া পরে সেই শক্তির মোহিনী মূর্ত্তি সকল কল্পনা করিলেন। সাধকের মনে বৃন্দাবন ফুটিল। মহাশক্তির পূজার পর কৃষ্ণের পূজা আরদ্ধ হইল। রাস ও দোলের ঘটা পড়িল। সম্বৎসর

ধরিয়া আমরা এইরূপে শক্তিকে পূজা করিতেছি। সম্বৎসর কি, সাংসারিক ও বিষয় কার্য্য কালে আমরা প্রতি মুহূর্ত্তেই শক্তির পূজা করিতেছি। এক এক বার মন কবিত্বে ফুটিয়া উঠে। বিষয়ীর হৃদয়ে পদ্মফুল ফুটে, জ্যোৎস্নালোক উদ্ভাসিত হয়। যখন যখন এইরূপ জ্যোৎস্নালোকে আমাদের হৃদয় প্রভাসিত হয়, তখনই আমরা হৃদয়ের কবিত্ব ও কল্পনা বাহিরে প্রকটিত করি। বাহিরে প্রকটিত করিয়া হৃদয়ের আনন্দ-উৎস উৎসারিত করি। এই আনন্দ-উৎস জন্মাষ্টমীতে প্রথম উৎসারিত হয়। ঘোর মায়ামোহ ও পাপান্ধকারে হৃদয় আচ্ছন্ন থাকিলেও আমাদের হৃদয়ে এক বার নবগ্রহের উদয় হয়। জন্মাষ্টমীতে শক্তির প্রথম রূপ বিকাশ হয়। একদা হৃদয়ের ঘনঘটার মধ্যে জ্যোৎস্না বিকাশিত হয়; অর্দ্ধরাত্রের ঘন অন্ধকারের পর হৃদয়ে অষ্টমীর আধ আধ জ্যোৎস্না ফুটে, হৃদয়ে দেবভাব সঞ্চারিত হয়। দেবভাব-রূপী দেবকীর গর্ভে সর্ব্ব ভূতের বাসস্থান-স্বরূপ বাসুদেব উদয় হন। কৃষ্ণের জন্ম হয়। যেন কি মহার্হ রত্ন লাভ হয়। এ রত্ন কাহাকে দিবার নয়। ইহা যেন চুরি করা ধন। ঐ পাপের কংশ মহাবৈরী; পুণ্যের অন্তরঙ্গ পাপ, হৃদয়ের শত্রু হৃদয়, এখনি এই শত্রু নবোদিত এই দেবরত্নকে হরণ করিবে, এ ধন রাখি কোথায়! এত আনন্দ হৃদয়ে ধরে না! এ ধন রাখিবার একমাত্র স্থান আনন্দধাম ও নন্দালয়। নন্দালয় গোপালয়, গোপালয় হৃদয়ের দেবালয় ও আনন্দধাম। সেই আনন্দধাম ও নন্দালয়ে নবোদিত আনন্দময় কৃষ্ণচন্দ্রকে লুকাইয়া রাখি। বিষয়-বাসনারূপী যমভগ্নী যমুনা পার করিয়া হৃদয়ের দেবমন্দিরে তাঁহাকে স্থাপন করি। যেন

তাহা হৃদয়ের কতই গুপ্তধন, কতই অমূল্য রত্ন! জন্মাষ্টমীতে একদিন এইরূপে কৃষ্ণের জন্ম হয়।

শক্তিপূজা।

যখনি মানবহৃদয়ের তমোরাশি তিরোহিত হইয়া হৃদয়ে দেবভাবের জ্যোৎস্না ফুটে, তখনই কৃষ্ণ জন্ম গ্রহণ করেন। এই জন্মাষ্টমী হয় ত প্রতিদিন প্রতিক্ষণে ঘটিতেছে। কিন্তু ইহার স্বরূপ কি প্রকার, তাহা বাহ্য জন্মাষ্টমীতে প্রকাশিত হইয়াছে। মানবহৃদয়ে যে শক্তির বিকাশ, ইহ জগতে মানব-চেতনায় যে শক্তি পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই শক্তি ভগবতী; তাহাই শ্যামা, তাহাই শ্যাম। বাহ্যজগতে জড়শক্তি যেমন দুর্দ্দমনীয়, চেতন জগতে মানবহৃদয়ের দেবভাব ও বলবিক্রম তেমনি দুর্দ্দমনীয় ও অপ্রমেয়। এই হৃদয়শক্তি, গঙ্গার ন্যায় বেগবতী। সেই বেগে ঐরাবত ভাসিয়া যায়। এই দেববল, এই কৃষ্ণশক্তি একদিন গিরিগোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া ইন্দ্রিয়পীড়নরূপ ইন্দ্রের কোপ নিবারণ করিতে পারে। এই কৃষ্ণশক্তি একদিন বিরাট-মূর্ত্তিতে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড অপেক্ষাও খরতররূপে প্রতীয়মান হইতে পারে। এই শক্তি এত বৃহৎ, যে তাহা বিষ্ণুনাম ধারণ করিয়াছে। তাহা হৃদয়ের প্রমত্ততাকে দমন করিয়া মধুসূদননামে প্রথিত হইয়াছে। মানবের হৃদয়-বলের নিকট মানবের দেহবল অতি সামান্য জ্ঞান হয়। এই নবদ্বারবিশিষ্ট দেহরূপ দ্বারকাপুরীর অতুল ঐশ্বর্য্য ও ধন, মণি ও মাণিক্য, বসন ও ভূষণ, বল ও বীর্য্য, সকলই কৃষ্ণশক্তির সহিত তুলনায় লঘু হইয়া পড়ে। রুক্মিণীর কৃষ্ণভক্তি সত্যভামার দর্পচূর্ণ করে। হৃদয়ে বিক্রম

যখন দেবভাবে শাসিত হইয়া কার্য্য করে, তখন তাহা অজেয় হইয়া পড়ে। যখন কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সারথি হন, তখন এই সংসারের কুরুক্ষেত্ররূপ কার্য্যক্ষেত্রের যুদ্ধে নিশ্চয় জয়লাভ হয়। পাপের দুর্য্যোধন ভীম গদাঘাতে পরাজিত হয়। দ্রৌপদীর অপমান লাঞ্ছিত হয়। ধর্ম্মরাজের সিংহাসন পুনঃস্থাপিত হয়। দ্বৈপায়ন ব্যাস এই কৃষ্ণশক্তির মাহাত্ম্য বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। তিনি সঞ্জয়ের মুখে এইরূপে কৃষ্ণগীত গাইয়াছেন ঃ—

"মহাত্মা বাসুদেব অপ্রমেয়, তিনি সর্ব্বভূতের বাসস্থান ও দেবসম্ভব বলিয়া তাঁহার নাম বাসুদেব। তিনি বৃহৎ বলিয়া বিষ্ণুনামে বিখ্যাত হইয়াছেন। মা শব্দের অর্থ বুদ্ধিবৃদ্ধি; তিনি মৌন, ধ্যান ও যোগ দ্বারা আত্মার উপাধিভূত সেই বুদ্ধিবৃত্তি দূরীকৃত করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম মাধব। তিনি সর্ব্বতত্ত্বের যথার্থ জ্ঞান লাভ করিয়া মত্ততারূপ মধুদৈত্যকে বিনাশ করিয়াছেন বলিয়া মধুসূদননামে প্রথিত হইয়াছেন। কৃষিশব্দের অর্থ সত্তা ও ন শব্দের অর্থ আনন্দ, মহাত্মা মধুসূদন সৎ ও আনন্দময়, রমণ ও লীলাময় বলিয়া কৃষ্ণনামে বিখ্যাত হইয়াছেন। পুণ্ডরীক শব্দের অর্থ পরম স্থান ও অক্ষশব্দের অর্থ অব্যয়, বাসুদেব পরম স্থানে বাস করেন ও তাঁহার ক্ষয় নাই বলিয়া তাঁহার নাম পুণ্ডরীকাক্ষ হইয়াছে। তিনি দস্যুগণকে বিত্রাসিত করেন বলিয়া জনার্দ্দন নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। বৃষভ শব্দের অর্থ বেদ ও ঈক্ষণ শব্দের অর্থ জ্ঞাপক; বেদ তাঁহার জ্ঞাপক বলিয়া তাঁহার নাম বৃষভেক্ষণ। তিনি কাহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন না বলিয়া তাঁহার নাম অজ। তিনি সাতিশয় দান্ত ও ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে স্বপ্রকাশ বলিয়া তাঁহার নাম দামোদর।

তিনি সর্ব্বভূতের পূরণকর্ত্তা ও সর্ব্বভূত তাঁহাতেই অবসন্ন হয় বলিয়া তাঁহার নাম পুরুষোত্তম। তিনি জয়শীল বলিয়া জিষ্ণু, নিত্য বলিয়া অনন্ত ও ইন্দ্রিয়গণকে প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া গোবিন্দনামে বিখ্যাত হইয়াছেন।" *

এই কথায় ব্যাস কৃষ্ণশক্তি কীর্ত্তন করিয়াছেন। সঞ্জয় এই সকল বাক্যে কৃষ্ণমহিমা কীর্ত্তন করিয়া পুত্রবৎসল অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মনে ধর্ম্ম ও কৃষ্ণভক্তি উৎপাদিত করিয়া দিয়াছিলেন। তজ্জন্য ধৃতরাষ্ট্রও একদিন দুর্য্যোধনকে ধর্ম্মবিরোধী যুদ্ধ-বিপক্ষে উপদেশ দিয়াছিলেন। হৃদয়ের এই সাত্ত্বিক ভাব, এই দেবভাব, এই ঐশীশক্তির সঞ্চার যখন অবিচলিত থাকে, তখনই তাহা কৃষ্ণশক্তি ও ভগবচ্ছক্তি। যোগীরা এই কৃষ্ণশক্তি ও ভগবচ্ছক্তি লাভ করিবার জন্য শরীর পতন করিতেন। ব্যাস ভগবদ্গীতায় যোগসিদ্ধির চরম ফল ও মোক্ষ বলিয়া ইহাকেই উল্লেখ করিয়াছেন। কৃষ্ণলাভের জন্য যোগসাধনা। ব্যাসের এই মহদ্বাক্য শাঙ্করভাষ্যে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। যে হৃদয় এই কৃষ্ণশক্তি ও সাত্ত্বিকবলে বলীয়ান হইয়াছে, তাহা নবজীবন লাভ করে। সাধক প্রতি বৎসরে কৃষ্ণশক্তি প্রাপ্ত হন। জন্মাষ্টমীতে প্রতি বৎসরে সাধকমণ্ডলীর হৃদয়ে কৃষ্ণের পুনর্জ্জন্ম হয়। জন্মাষ্টমীতে শক্তির পুনর্জ্জন্ম হয়। যখন ঘোর প্রাবৃট্‌কালে, ঝঞ্ঝাবাত ও বর্ষা ঋতুতে সংসার ধ্বংস হইবার উপক্রম হইতেছে, তখন সাধক ভাবেন, আবার প্রলয়ের পর সৃষ্টি হইবে। শুষ্কপত্র পড়িলে শরতের বৃক্ষলতায় আবার নবপত্র মুঞ্জরিত হইবে। মহাশক্তি আবার জন্মলাভ করিবেন। আবার

* মহাভারতীয় যানসন্ধি পর্ব্বান্তর্গত একোনসপ্ততিতম অধ্যায় দেখ।

সংসার সুচারুরূপে এক বৎসর চলিবে। এই এক বৎসরে বারে বারে শক্তির রূপ দেখ, আর শক্তিকেই পূজা কর। কখন শক্তির বিকট মূর্ত্তি দেখ, কখন শক্তির মোহিনী মূর্ত্তি দেখ। যখন শক্তির সৃষ্টি আরব্ধ হয়, তখন তাঁহার মোহিনী মূর্ত্তি। তখন তিনি কৃষ্ণমূর্ত্তিতে জন্মলাভ করেন। সাধকের মনে এই মূর্ত্তিতে ঐশীশক্তি প্রথম উদয় হন। বালার্কের ন্যায় এই ঐশীশক্তির প্রথম আভাস। হৃদয়-গগনে এই শক্তি যেমন উদিত হইতেছেন, তেমনি তাঁহার আলোক-প্রভা দেখা দিতেছে। শক্তি যেমন বিকাশ-প্রাপ্ত হইলেন, যেমন তাঁহার তেজ বাড়িল, হিন্দু অমনি দুর্গাপূজা করিলেন। আবার ঋতু-ক্রমে যেমন শক্তির বাহ্য-বিকাশ হইতে লাগিল, শক্তিমান্ নব নব ভাবে, নব নব মূর্ত্তিতে বিকশিত হইলেন, তৎসঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নব নব পূজার ব্যবস্থা হইল। শরতে, বসন্তে, পূর্ণিমায়, অমাবস্যায় শক্তিমানের নব নব মূর্ত্তি দেখা যায়, সুতরাং সেই সেই কালে তাঁহার নববিধানে প্রতিমা-প্রতিষ্ঠা ও পূজা। সম্বৎসর ধরিয়া এইরূপে হিন্দুরা শক্তি-মানের পূজা করিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, এ জগতে শক্তি ভিন্ন আর কিছুরই পূজা হয় না। বিকটমূর্ত্তিতেও শক্তি, অতি মোহিনী মূর্ত্তিতেও শক্তি। শক্তি ভয়ঙ্করী, শক্তি মোহকরী, শক্তির এই হরিহর মূর্ত্তি। শক্তিকে শুদ্ধ ভয় করি না, তাঁহার প্রভাবে মোহিতও হইয়া যাই। শক্তি কখন ভয় দেখাইতেছেন, কখন চমকিত করিতে-ছেন, ধীরে ধীরে হৃদয়কে আকর্ষণ করিতেছেন, কখন হৃদয়কে নাচাইতেছেন, কখন ভক্তির উৎস উৎসারিত করিতেছেন। যাহা কিছু ঘটিতেছে, সকলই শক্তির বিকাশ মাত্র। আইস

আমরা মহাশক্তিকে পূজা করি। তাঁহার পদে প্রণত হইয়া তাঁহার সাধনা করি। সাধনা করিলেই সিদ্ধি হয়। জগতে শক্তির সাধনায় সকলই সম্পন্ন করা যায়। ভারতের পূর্ব্বতন উন্নতি সকলই শক্তির সাধনা-প্রভাবে। আজি ইউরোপীয় সভ্যতা শক্তির মাহাত্ম্য শতমুখে ঘোষণা করিতেছে।

আমাদের পূর্ব্বতন আর্য্যজাতি যে শক্তিপূজা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহা অলীক কল্পনা নহে। জগতে যদি কিছু সৎ ও নিত্য পদার্থ থাকে, তাহা সর্ব্বশক্তিমান্, তাহা সাংখ্যের পুরুষ প্রকৃতির সমষ্টি-মূলতত্ত্ব, তাহা বেদান্তের মায়াশ্রিত একমেবাদ্বিতীয়ং। তাহা একদা জগতের আশ্রয়, আবার তাহারই পরিণাম জগৎ। তাহা নিজে নিত্য ও অপরিণামী; কিন্তু তাহার বিশেষ গুণ এই, তাহা অসংখ্য পরিণাম প্রাপ্ত হইতে পারে, অথচ অপরিবর্ত্তনীয়রূপে আবার দেখা দেয়। এই জন্য তাহাকে নিত্য সৎপদার্থ কহে। তাহা সৎ বটে, অথচ শক্তি ও মায়া তাহার রূপ। তাহা নিত্য পুরুষ বটে, অথচ প্রকৃতি তাহার পরিণাম, জগৎ তাহার রূপ। তাহা চিরকালই বর্ত্তমান, চিরকালই পুরুষ প্রকৃতির অভিন্ন ভাব। যিনি ভিন্ন ভাবেন, তিনি কল্পনায় ভিন্ন ভাবেন মাত্র। প্রকৃতি পুরুষ নিজে অভিন্ন। কল্পনায় ভিন্ন ভাবিতে পারা যায় বলিয়া বাস্তবিক প্রকৃতি পুরুষ ভিন্ন নহেন। আমরা ভিন্ন করিয়া ভাবি মাত্র। এই মহাশক্তিমানের তুলনা নাই। এজন্য এই মহাশক্তিমানের প্রকৃতি ও ধর্ম্ম তুলনা অথবা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝান যায় না। যিনি তুলনা ও দৃষ্টান্ত দেখাইতে যাইবেন, তিনি নিশ্চয় ভ্রমে পতিত হইবেন; কারণ, অনিত্য জাগতিক ব্যাপারের সহিত নিত্য বস্তুর তুলনা হয় না।

দেবপূজা পৌত্তলিকতা নহে।

আমরা তত্ত্ব-জ্ঞানে এই শক্তিমানকে অনুভব করি। সামান্য জ্ঞানে শক্তিমানের স্বরূপ বুঝিতে পারি না, কিন্তু তাহার আভাস পাই মাত্র। তাহাই জ্ঞানের অনুভব ও উপলব্ধি। এই উপলব্ধি মিথ্যা কল্পনা নহে। ইহাকে যিনি মিথ্যা বলিবেন, তাঁহার নিকট কিছুই সত্য নাই। জ্ঞান তাহাকে বাস্তবিক পদার্থ বলিয়া উপলব্ধি করে, তাহার গুণাগুণ বিচার করে, তাহার মাহাত্ম্য, প্রকাণ্ডতা, সৌন্দর্য্য, ভীষণতা, তাহার অনন্ত ও নিত্যভাব উপলব্ধি করে। কিন্তু মানবের মন শুদ্ধ উপলব্ধি করিয়া ক্ষান্ত হয় না। উপলব্ধিতে এই মহাশক্তিমানের যে সকল গুণাগুণ অনুভূত হয়, কল্পনা তাহাদিগকে সাজাইতে বসে। কারণ, মানুষ শুদ্ধ জ্ঞানবান প্রাণী নহে। মানুষের কল্পনা, বোধ হয়, জ্ঞানবৃত্তি অপেক্ষাও তেজস্বিনী। জ্ঞানার্জ্জিত সামগ্রী সকল কল্পনা মূর্ত্তিমতী করিয়া দেখাইতে চায়। কেন দেখাইতে চায়? মানুষ শুধু জ্ঞানবান নহে, কল্পনাসম্পন্নও নহে। মানুষ জ্ঞান, কল্পনা ও প্রবৃত্তিময়। তিনি এই তিন গুণে সমগ্র মনুষ্য। জ্ঞান যাহা উপলব্ধি করে, ভক্তি বলে, আমি তাহা পূজা করিব। প্রীতি বলে, আমি তাহা ভালবাসিব। অনুরাগ বলে, আমি তাহা যতনে ধারণ করিব। দয়া বলে, আমি তাহাকে স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত করিয়া রত্নময় সিংহাসনে বসাইয়া তাহার জন্য দেবমন্দির গড়িয়া দিব, সেই মন্দির-চত্বরে অন্নসত্র করিব। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অতুল ভাণ্ডার হইতে জ্ঞান যে সকল রত্ন আহরণ করিয়া হৃদয়রাজ্যে আনয়ন করে, অনুরাগ, প্রীতি, দয়া ও ভক্তি অমনি তাহা দেখিতে

পায়। কল্পনা জাগরিত হইয়া উঠে, শোভার উপর শোভার সৃষ্টি করে, সৌন্দর্য্যকে মূর্ত্তিমান করে; অনুরাগ, প্রীতি ও ভক্তির সামগ্রীকে মূর্ত্তিমতী করে। এই সমস্ত আধ্যাত্মিক ব্যাপার অলীক স্বপ্ন নহে। এই আন্তরিক ব্যাপার প্রতিক্ষণে প্রতি লোকে ঘটিতেছে। কল্পনা যে মূর্ত্তি দেয়, তাহা অলীক সৃষ্টি নহে। তাহা বাস্তবিক জ্ঞানোপলব্ধির সামগ্রী। কল্পনা যখন ভক্তির আদেশক্রমে এই মূর্ত্তি সকল গড়িতে থাকে, তখন হৃদয় দেব-মূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ হয়; হৃদয়ে প্রতিমার প্রতিষ্ঠা হয়। সেই হৃদয়-প্রতিমার বাহ্য বিকাশ মাত্র দুর্গোৎসব, সরস্বতী ও লক্ষ্মীপূজা, কালী ও জগদ্ধাত্রী পূজা, রাধা ও কৃষ্ণলীলা। হৃদয়ে যে মূর্ত্তি আগে কল্পনা স্বর্ণসিংহাসনে বসাইয়াছে, ভক্তি আগে যে মূর্ত্তিকে ফুল ও চন্দনরসে চর্চ্চিত করিয়াছে, বাহিরে, পরে আমরা সেই প্রতিমাকে মূর্ত্তিমতী করিয়া পূজা করি। এ কি মিথ্যা কল্পনা? এ কি ভ্রান্তি? এ কি পৌত্তলিকতা, এ কি পুতুল পূজা, ছেলে খেলা? যে এ কথা বলে, সে মহা ভ্রান্ত। এইরূপ প্রতিমাপূজার ফল—ভারতীয় মুনি ঋষিগণ।

এ যদি পৌত্তলিকতা হয়, জগৎ এই পৌত্তলিকতায় পরিপূর্ণ, প্রতি লোক এই পৌত্তলিকতায় পরিপূর্ণ। যে দোষারোপ করে, সেই নিজে পৌত্তলিক; সে নিজেই প্রতিক্ষণে প্রতি মুহূর্ত্তে শক্তির উপাসনা করিতেছে। এই শক্তি-পূজা শুদ্ধ হিন্দুর পূজা নহে; ইহা সর্ব্বজাতির সম্পত্তি। প্রাচীন হিন্দুরা সাধারণ হৃদয়-তত্ত্ব তন্ন তন্ন বুঝিয়াছিলেন। বুঝিয়া, যে প্রতিমা-পূজা, যে শক্তিপূজা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, এক দিন তাহা সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত হইবে, এমত আশা করা যাইতে পারে। জগৎ যখন হিন্দুর

ব্যবস্থা ও পূজা পদ্ধতির প্রকৃত অর্থ ও গূঢ় তত্ত্ব গ্রহণ করিবে, তখন জগৎ সেই পদ্ধতিতে নিশ্চয় মাতিবে। এই আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস। এখন শুদ্ধ এই চাই, প্রাচীন হিন্দুরা যাহা করিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহার প্রকৃত অর্থ গ্রহণে সমর্থ হই, ও তদনুসারে কার্য্য করিতে অগ্রসর হই। শক্তির প্রকৃত পূজা আরম্ভ করি। রাধাকৃষ্ণে সাধকের ভক্তিভাব দেখি, বৈজ্ঞানিকের শক্তিসাধনা দেখি। সরস্বতী ও গণেশ পূজায় জ্ঞানালোচনা করি। লক্ষ্মীপূজায় ভারতকে ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ করি। কার্ত্তিক পূজায় প্রকৃত পুরুষকার ও কুমারের দেববীরত্ব লাভে যত্নবান হই। মহিষমর্দ্দিনী ভগবতী দুর্গা পূজায় পশুবলরূপ মহিষাসুরকে বিনাশ করিতে শিখি। কালী পূজায় পাপের রক্তবীজের ধ্বংস করিতে শিখি। জগদ্ধাত্রী পূজায় পশুবলকে শাসন করিতে শিখি। এবং যাহাতে লোক-সমাজের পরিত্রাণ ও রক্ষা হয়, পরিপুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি হয়, এরূপ সদনুষ্ঠানে দিনরাত ব্যাপৃত হই। এরূপ শক্তি পূজার প্রতিষ্ঠা না হইলে ভারত উঠিবে না,—আমাদের উন্নতি সাধন হইবে না। আইস, আমরা এক-তানে, একমনে সকল হিন্দু ও ভারতবাসী মিলিয়া প্রকৃত শক্তিপূজায় প্রবৃত্ত হই। আর এক বার জগতে ভারতের জয় ঘোষণা করি।

বসন্তে।

বসন্তে প্রকৃতি-সুন্দরী।

বসন্তকালের নাম করিবামাত্র মনে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের সঞ্চার হয়। সে ভাবকে তুমি কি বলিবে? বলিবে সৌন্দর্য্য—কান্তি—শোভা—রূপ—লাবণ্য—রমণীয়তা? তা বলিলেও তো তৃপ্তি হয় না। সে সৌন্দর্য্যের সহিত যে মাধুরী আছে, সে কান্তির সহিত যে কোমলতা আছে, সে শোভার সহিত যে শ্যামলতা আছে, সে রূপের সহিত যে নবীনতা আছে, সে লাবণ্যের সহিত যে বিচিত্রতা আছে, সে রমণীয়তার সহিত যে এক অভূতপূর্ব্ব সুখ আছে। এ সমস্ত ভাবের সঙ্গে যে এক উল্লাস আছে—যে উল্লাসে শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত হয়, যে উল্লাসে পিকবধূ ডাকিয়া উঠে, যে উল্লাসে কুসুমাবলী প্রস্ফুটিত হয়, যে উল্লাসে ভ্রমরা ফুলে ফুলে গুঞ্জরিয়া বেড়ায়, যে উল্লাসে মলয়ানিল কুঞ্জে কুঞ্জে ভ্রমণ করিয়া চারিদিক সৌরভে পরিপূর্ণ করে, আর ধীরে ধীরে মৃদুহিল্লোলে তোমার গাত্রে মধুরতা সঞ্চারিত করে—বসন্তের সে উল্লাসকে তুমি কি কথায় বিকাশ করিতে চাও? সে উল্লাস কি কথায় প্রকাশিত হয়।

এই মধুর বসন্তকালে প্রকৃতি শত শোভায় শোভিতা। বনে বল্লরী সকল মৃদু সমীরণে নৃত্য করিতেছে। তরুরাজি নব কিসলয়ে নানাবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে। প্রসূনরাশি তরুরাজিকে

শোভিত করিয়াছে। ভারতের উদ্যানরূপ বঙ্গদেশে বসন্তের রমণীয়তা সর্ব্বত্র-ব্যাপ্ত। কুসুমাকর সর্ব্বত্রই কুসুমমালায় সুশোভিত। কিসলয়-কান্তিও কুসুমের সৌন্দর্য্যে সুরঞ্জিত। বনবল্লরীর নৃত্য ও হাস্য, কুসুম-শোভা বুঝি পরাজিত করে। মুকুলমালাও ফুলকুলবিজয়িনী। দেখিতে দেখিতে কত ফুল ফুটিতেছে। কত বিচিত্র বর্ণের রাগরঞ্জন তোমার চিত্তবিমোহন করিতেছে। আর জলে—সরোবরে নলিনী ঢল ঢল করিতেছে। এ যে সকল শোভাকে পরাজয় করিল! তেমন সুষমা, তেমন রমণীয়তা বুঝি আর কুত্রাপি নাই। তুমি যদি কবি হও, তবে এই রমণীয় রূপ যথার্থ অনুভব করিতে পারিবে। তবে সেই সরোবরের কমলরঞ্জিত দেশকে প্রকৃতিসুন্দরীর এক বিচিত্র আসন-রচনা বলিয়া দেখিতে পাইবে। সেই বিচিত্র কমলদল-সুরঞ্জিত আসন যেন কোন দেবীর জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। ঋতুরাজ বুঝি প্রেমপ্রতিমার জন্য সেই আসন রচনা করিয়াছেন। কবি! তুমি সেই কমলদলবাসিনীকে সেইখানে কল্পনা কর। কল্পনা কর, তিনি সেই কমলদল শোভিয়া উদয় হইলেন, উদয় হইয়া সরসীমাঝে দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইলেন, করে কমলিনী। চন্দ্রনিভাননা অবনত মুখে সরসীর মোহনমুকুরে বুঝি নিজ মুখ-বিম্ব দেখিয়া মোহিতা। তাই ঈষৎ বঙ্কিমভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। দেখিতেছেন, যেন সেই ভঙ্গিমাতেই তাঁহাকে ভাল দেখায়। বিম্বাধরার মুখমাধুরী ঝরিয়া পড়িতেছে। সেই মাধুরীর নিঃসরণে এক একটি নব কমল প্রস্ফুটিত হইতেছে, অথবা কোথাও কমলদলে নব নব রাগরঞ্জন উদ্ভাসিত হইতেছে। মোহিনীর চিকুরদামে কত কুন্দকলি বিকসিত। পৃষ্ঠে লম্বিতা বেণী।

চিরযৌবনা নবলাবণ্যে বিমোহিনী। প্রেমের মধুরতা সেই লাবণ্যে; আর চির-নবীনতা সেই যৌবনে। প্রেমের সরসতায় নবীনা প্রফুল্লিতা। প্রফুল্লিতা যেন কুসুমশোভা। মধুকর-নিকর তাই গুন্ গুন্ গুঞ্জরিয়া ভ্রান্তিক্রমে কভু বিম্বাধরে, কভু বা কপোলকান্তিতে বসিতে আসিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া দূরে যাই-তেছে। বসন্তরাগের নবীনতা, মনোহারিতা এবং সৌকুমার্য্য তাঁহার রূপে বিকশিত হইয়াছে। দেবজ্যোতিঃ তাঁহার চারি-ধারে। পুষ্পবর্ষণে যেন সেই বিভা ঝরিয়া পড়িতেছে। দেবতারা বুঝি পুষ্পবর্ষণ করিতেছেন। সৌরভে দিগ্দশ আমোদিত।

কবি সেই কমলাসনে প্রেমময়ী প্রকৃতিসুন্দরীকে কল্পনাচক্ষে দেখিতে পান। দেখিতে পান—সেই প্রেমময়ী দেখিতে দেখিতে স্বপ্নবৎ হৃদয়ে মিলাইয়া যান। তাঁহার প্রেমভাব হৃদয়ে প্রস্ফুরিত হইতে থাকে। তখন কবি বাসন্তী দেশের সমস্ত সৌন্দর্য্যে ও নবজীবনে—কুঞ্জে, বনে, কান্তারে, নবপল্লবে, নবকুসুমে, নব-রঞ্জনে এক অভূতপূর্ব্ব প্রেমের বিকাশ দেখিতে পান। দেখেন, প্রেমে পুনর্জ্জীবিতা প্রকৃতি, বসন্তের নবসৌন্দর্য্যে বৃন্দাবনশোভা বিকাশ করিয়া জগৎকে মুগ্ধ করিতেছেন। অথবা প্রকৃতি বুঝি পুরুষকে সাজাইতেছেন—প্রেমময়ী প্রকৃতি বুঝি পুরুষকে প্রেম-ময়রূপে সাজাইতেছেন। জগৎপতি আজি প্রেমময়ী প্রকৃতি-সুন্দরীর লীলায় অনুরক্ত। প্রেমময়ী প্রকৃতি যেন নিজ মাধুরীতে জগৎসংসারকে নবজীবনে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতেছেন। সংসার প্রফুল্লতায় হাসিতেছে। আনন্দময়ের সংসারধাম নবরসে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। বসন্তময় সেই আনন্দ ও উল্লাস।

বসন্তোৎসব।

আর্য্য-ঋষিগণ যেমন চিন্তাশীল, তেমনি ভাবুক ছিলেন। তাঁহারা পণ্ডিতের সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে চিন্তা করিতেন, আবার কবির কল্পনায় সেই সকল চিন্তা-প্রসূত রত্নকে সজ্জিত করিতেন। তাঁহারা যাহা দেখিতেন, কবির রসে তাহা আপ্লুত করিতেন। প্রকৃতির ঐশ্বর্য্যপূর্ণ আর্য্যধামে যাঁহারা বাস করিতেন, তাঁহারা যে স্বাভাবিক কবি হইবেন, তাহা কিছু আশ্চর্য্য নহে; কিন্তু আশ্চর্য্য এই, সেই আর্য্যধামে আমরাও বাস করিয়া, আমাদের রসহীন হৃদয়ে তাঁহাদের কাব্য-ভাব-গ্রহণে অনেক সময়েই অসমর্থ হই। কাব্যকে আমারা রসহীন করিয়া নীরস ঘটনারূপে অবলোকন করি। যাহা হউক, যে ঋষিগণ এইরূপ স্বাভাবিক কবি ছিলেন, মধুময় বসন্তকালে তাঁহাদের হৃদয় উৎস যে সহস্র ধারায় উৎসারিত হইবে, তাহা বিচিত্র নহে। দার্শনিক চক্ষে তাঁহারা প্রকৃতির বসন্ত সজ্জা অবলোকন করিয়াছিলেন, এবং কবির হৃদয়ে তাহার প্রকৃত অনুভাব সকল আঁকিয়া গিয়াছেন। বসন্তকালে প্রকৃতি যখন মহোৎসবে সজ্জিত, আর্য্য-ঋষি তখন সেই মহোৎসবে মিশিয়া উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিলেন। উন্মত্তপ্রায় হইয়া সেই বসন্তোৎসবের যে সকল ছবি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার এক উৎসব-ছবি বসন্ত-পঞ্চমী, আর এক ছবি শিব-চতুর্দ্দশী, তৃতীয় চিত্র মদনোৎসব, চতুর্থ ছবি দেব-দোল, এবং সর্ব্বশেষ সাধারণ মহোৎসব—বাসন্তী পূজা। এখন দেখা যাউক, এই সকল চিত্রাবলীতে কত নিগূঢ় ভাবসমূহ সঞ্চিত আছে।

বসন্ত-সজ্জিত শোভাময় প্রকৃতি-মন্দিরের দ্বারদেশে প্রথমেই জ্ঞানদেবী। সেই মন্দির-সমক্ষে উপস্থিত হইলেই তুমি বিদ্যা

দেবীকে দেখিতে পাইবে। তিনি অতি মোহন বেশে সেই বসন্ত-সজ্জার মধ্যদেশে হৃদয়-আকর্ষণী মূর্ত্তিতে দর্শককে আহ্বান করিতেছেন। সেই বসন্ত সজ্জা মাঝে বিদ্যাদেবীর মূর্ত্তি যত মোহন ভাবে গড়িতে হয়, আর্য্য-কল্পনা তাহা গড়িয়া গিয়াছে। সেই মূর্ত্তি সরস্বতী—ব্রহ্মাণ্ডের শতদল তাঁহার পদতলে, জ্ঞানা-কর্ষণী মধুময় বীণা তাঁহার করতলে, মোহকরী শ্রী ও লাবণ্য তাঁহার মুখমণ্ডলে, জয়ের উজ্জ্বল কিরীট তাঁহার কুন্তলে,সাত্বিক-জ্ঞানরূপ পবিত্র বিশদ বরণের বিমলতা তাঁহার বক্ষঃস্থলে।

বসন্তকালের শোভাময় বিশ্বদৃশ্য মধ্যে অবস্থিত হইয়া আর্য্য-ঋষি ভাবিলেন, বিশ্বের এ কি কাণ্ড! কিছু দিন পূর্ব্বে দেখিলাম, জগৎ অতি বিশীর্ণ অবস্থায় আছে, তাহা শুষ্কপ্রায় ও নীরস হইয়া আসিতেছে। আজি অচিরাৎ তাহা কিরূপে সরস ও শোভাময় হইল। জগতের এই যে পরিবর্ত্তন, এই যে হ্রাস-বৃদ্ধি, ইহা কিরূপে সম্পাদিত হয়? দিন দিন বৃক্ষ লতা কেমন গজাইয়া উঠিতেছে, কুসুম সকল বিকশিত হইতেছে, মুকুল উদ্গত হইতেছে, কোকিলের কণ্ঠধ্বনি কেমন শনৈঃ শনৈঃ উত্থিত হইতেছে! এ রহস্য কে আমায় বুঝাইয়া দিবে? কালি যাহা মৃতপ্রায় শুষ্ক ছিল, আজি তাহা পুনর্জীবিত হইয়া উঠিল কিরূপে? মৃত্যু ও জন্মের প্রহেলিকা কে বুঝাইবে? শুদ্ধ মৃত্যু ও জন্ম কেন? ঐ যে পল্লব দিন দিন ধীরে ধীরে বাড়িতেছে, উহার বৃদ্ধির রহস্যই বা কি?

সন্দেহের আন্দোলনে জ্ঞানের জন্ম; আমাদের আর্য্য-ঋষির মনে এই রূপে জ্ঞানালোক প্রভাসিত হইল। তাঁহার অন্তরে যেন ঈষৎ জ্যোৎস্নালোক আসিল। অমনই তিনি সেই জ্ঞানের

অধিকতর প্রস্ফুরণের জন্য বিদ্যাদেবীর আরাধনা করিবেন, স্থির করিলেন। বিদ্যাদেবীর আরাধনা না করিলে, কে তাঁহাকে তত্ত্বজ্ঞানে লইয়া যাইবে? কে তাঁহাকে দিব্য চক্ষু দিবে? তিনি দিব্য চক্ষুলাভ করিবার জন্য বিদ্যাদেবীর ধ্যান ও আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। হৃদয়ে বাসন্তী-পঞ্চমীর জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে, সেই শ্রীপঞ্চমীতে সাত্ত্বিক জ্ঞানের আরাধনায়, বিদ্যাদেবীর পূজায় জগতের বাসন্তী শোভা পরিপ্লুত করিলেন। সাধক ষড়্রিপু ও পঞ্চেন্দ্রিয়ের সংযম সাধন করিয়া তবে ষট্‌-পঞ্চমীতে তত্ত্বজ্ঞান-রূপিণীর আরাধনায় অধিকারী হইয়াছেন।

তত্ত্বজ্ঞানরূপিণী সরস্বতী হৃদয়ে আবির্ভূত হইলেন। আর্য্য-ঋষি তখন বিশ্বের বাসন্তী সৌন্দর্য্যধামে সেই সরস্বতী দেবীকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। দেখিলেন, সেই দেবীই এ শোভার লাবণ্য ও শ্রী; সমুদায় বসন্ত-দেশকে দেবী আলোকিত করিয়াছেন। কি যেন দিব্যালোক আসিয়া বসন্ত-ধামের শ্রী সম্পাদন করিল। সেই বসন্ত-সৌন্দর্য্য আরও সুন্দরতর হইল; জগৎ দিবা শোভায় শোভিত হইল। তাহার স্থূল শোভার অন্তর হইতে সূক্ষ্ম শোভার আর এক জ্যোতিঃ ফুটিল। সেই জ্ঞানজ্যোতিতে বসন্ত শোভার দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইল।

আর্য্য-ঋষি দেবীর আরাধনা করিলেন। ধ্যানে তিনি তাঁহার যে রূপ দেখিলেন, সেই রূপে তাঁহাকে হৃদয়মন্দিরে স্থাপন করিলেন। সেই সরস্বতীর রূপ আজিও জগজ্জনের মনোহরণ করিয়া রহিয়াছে। আর্য্য-ঋষির জ্ঞানালোক বৃদ্ধি করিবার জন্য দেবী তাঁহাকে সেই বাসন্তীয় জগতের অভ্যন্তর দেশে প্রবেশলাভের অধিকার দিয়া, প্রকৃতি-দেবীর মন্দির-

দ্বার মুক্ত করিয়া দিলেন। দেবীর দিব্য জ্যোতিঃ ঋষির সঙ্গে সঙ্গে গমন করিল। ঋষি সেই জ্ঞানদ্বার দিয়া প্রকৃতি-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। স্থূল প্রকৃতি ভেদ করিয়া বিজ্ঞানধামে আসিলেন; পুরোভাগে দিব্য জ্যোতিঃ পথপ্রদর্শক।

দেখিলেন, প্রকৃতির সমুদায় ক্রিয়াই অভ্যন্তরে। বাহিরে যাহা দেখা যায়, তাহা অনবরতই পরিবর্ত্তিত হইতেছে, প্রকৃতির রূপ কোন সময়েই স্থির নহে। সৃষ্টি, লয়, ও স্থিতি নিয়তই ঘটিতেছে। এমন ক্ষণ নাই, যখন সৃষ্টি ও লয় হইতেছে না। একাধারে জন্ম, পরিপুষ্টি, বর্দ্ধন ও লয়। সকলই এক বীজ-মূলক; এই একই বীজ হইতে পদার্থের সৃষ্টি হইতেছে, পরিপুষ্টি হইতেছে, এবং প্রলয় হইতেছে। যাহা মূলতত্ত্ব তাহা অনন্ত, নিত্য ও অব্যয়, কিন্তু পরিবর্ত্তন তাহার নৈমিত্তিক ভাব। সকলই এই অনন্ত সত্ত্বে বিলীন ও পঞ্চত্ব পাইতেছে, আবার সেই লীনসত্ত্ব নবীভূত হইয়া নব নব রূপে উদয় হইতেছে। যাহাতে লীন হইতেছে, তাহাতেই জন্মগ্রহণ করিতেছে।

তোহে জনমি পুন, তোহে সমাওত
সাগর লহরী সমানা।

বাস্তবিক সমগ্র প্রকৃতি-রাজ্য অনন্ত মূলসত্ত্বেরই তরঙ্গলীলা মাত্র। কিন্তু এই তরঙ্গলীলা অনন্তকালই চলিতেছে, কখনই তাহার বিরাম নাই। তাই, পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, জগৎ প্রবাহ-রূপে নিত্য; তাহা কূটস্থ নিত্যতাপেক্ষা অনিত্য হইলেও প্রবাহরূপে নিত্য। এই নিত্য জগৎ-কার্য্যের আদিকারণ—কূটস্থ নিত্যসত্ত্বা। ভগবান্ সেই নিত্যসত্ত্বা; প্রকৃতি সেই নিত্য-সত্ত্বা মধ্যে রজঃ ও তমোগুণে জাগতিক ব্যাপারের মহামায়া

সমুৎপাদন করিতেছেন। তাই তিনি মহামায়ারূপে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কারিণী।

আর্য্য-ঋষি ক্রমে প্রকৃতির অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া প্রলয়ের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিলেন। প্রলয়ই সৃষ্টির মূল, প্রলয়ই পরিপুষ্টির মূল। লীন অবস্থা ধর্ম্মাধর্ম্ম জন্য নবীভূত হইয়া সৃষ্টি হইতেছে। অসংখ্য পদার্থের লীন অবস্থাতেই পদার্থ-বিশেষের পরিপুষ্টি। এই প্রলয়-স্রোত অনবরত চলিতেছে, আর প্রকৃতির অবস্থান্তর ঘটিতেছে। সমীরণের পরিমল-বহনে কুসুমের ধ্বংস! কুসুমের পরিমলহরণে মনুষ্যের নাসারন্ধ্রের উল্লাস ও বর্দ্ধন! জগৎ, তুমি শুদ্ধ বিলয়ে পরিপূর্ণ! সকলই লয় হইতেছে, অথচ কিছুরই একেবারে একান্ত বিনাশ নাই! পঞ্চত্ব, লয়;—আবার সৃষ্টি! এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডময় কেবল লয় ও সৃষ্টি চলিতেছে। দ্যুলোক, ভূলোক, নক্ষত্রলোক, ব্রহ্মলোক, অসংখ্য ও অনন্তলোকে এই প্রলয়ের আবর্ত্তন! ঋষি এই মহাকালকে নমস্কার করিলেন। যাহাতে সকল ভূত লয় প্রাপ্ত হইতেছে, অথচ সকল ভূত যাহা আশ্রয় করিয়া আছে, সেই ভূতনাথকে প্রণাম করিলেন। একবার তাঁহার ধ্যান করিলেন। দেখিলেন, ভূতনাথ পঞ্চভূতের পতি হইয়া পঞ্চমুখ।

আর্য্য-ঋষির মনে এইরূপে ক্রমে ক্রমে প্রলয়ের ভয়ঙ্কর তিমির আসিতে লাগিল। জ্ঞান ও বুদ্ধির পূর্ণ জ্যোতিঃ যেন মলিন হইতে লাগিল। পূর্ণিমা গেল, হৃদয়ে কেবলই তমোরাশি। ক্রমে এই তমোরাশি ঘনীভূত হইয়া ঘোর অন্ধকারে পরিণত হইল। তখন আর্য্য-ঋষি একদা সেই চতুর্দ্দশীর ঘোর অন্ধকারে মহাকালের অনুভব ও ধ্যান করিতে বসিলেন। কোথা দিয়া

দিন রাত্রি কাটিয়া গেল। হৃদয়ে মহাকালের প্রতিকায় জাজ্বল্যমান হইল। মহাকাল মহারুদ্রমূর্ত্তিতে দেখা দিলেন। তখন আর্য্য-ঋষি শিবরাত্রে সেই ধ্বংসকারী ত্রিশূলধারী শঙ্করের পূজা করিলেন। তাই আজিও এই মধুময় বসন্তকালে ভয়ঙ্কর মহাকালের পূজা প্রচলিত আছে।

আর্য্য-ঋষি সেই আশুতোষের পূজায় সিদ্ধিলাভ করিলেন। পূজায় বুঝিতে পারিলেন, লয়ই সৃষ্টির মূল। জগৎ নিয়তই নূতন হইয়া সমুদ্ভূত হইতেছে। পুরাতনে যখন কাজ চলে না, তখন সেই পুরাতন দ্রব্য নবীভূত হইয়া উঠিতেছে। যাহা অমঙ্গলের আধার, তাহা বিনষ্ট হইয়া মঙ্গলাধার হইতেছে। অতএব মহাকাল,—শিবময় মহেশ্বর। এই শিবময় শঙ্করের পূজায় জগৎরহস্য কিছু বুঝিতে পারিয়া আর্য্য-ঋষি প্রকৃতির আরও গভীরতর দেশে প্রবেশ করিলেন; বিজ্ঞান-জ্যোতিঃ তাঁহাকে এক নূতন দেশ দেখাইল। আর্য্য-ঋষি মহামায়া প্রকৃতির অভ্যন্তরস্থ যে সৎপদার্থের আভাস পাইয়াছেন, বিজ্ঞান-জ্যোতিঃ এখন তাঁহাকে সেই দিকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। মহামায়া প্রকৃতি যাঁহার আশ্রয়, সেই পরম পুরুষের সহিত প্রকৃতির মিলন কিরূপ, আর্য্য-ঋষি তাহা দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। বুঝিলেন, প্রকৃতি সংসারী, মহাকাল উদাসীন। উদাসীন মহাকাল সংসারী হইলেই প্রকৃতিরূপে আবির্ভূত হন। লয় সৃষ্টিতে পরিণত, সৃষ্টি লয়ে পরিণত। এই ব্যাপার চিরকালই চলিতেছে। চিরকালই মহাকাল উদাসীন, চিরকালই সংসারী। যখন এইরূপ চলিয়াছে, তখন অবশ্য বলিতে হইবে, পুরুষ-প্রকৃতি উভয়ই অনাদি। তখন আর্য্যঋষি গাইয়া উঠিলেন :—

"প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।"

(ভগবদ্গীতা, ১৩ অ, ১৯ শ্লোক)

অনাদি কাল হইতে তবে পুরুষ সংসারী এবং প্রকৃতিতে আসক্ত। কি গভীর ও স্থায়ী প্রণয়! অনাদি কাল হইতে এই প্রেম চলিয়া আসিতেছে। পৃথিবীতে এরূপ আসক্তি ও প্রেম ত আর কোথাও দেখা যায় না। প্রকৃতিই যথার্থ সতী নামের পাত্রী। পুরুষ-প্রকৃতির প্রেমই প্রেম; এ প্রেম অতুল্য, নিত্য, অপ্রমেয়। এই প্রেম দেবতা; এই প্রেমকে পার্থিব প্রেম হইতে পৃথক করিয়া আর্য্য-ঋষি তাহার স্বতন্ত্র নামকরণ করিলেন। সেই প্রেম-দেবতার নাম দিলেন—মদন; আর সেই চির-আসক্তির নাম দিলেন—রতি। তখন আর্য্য-ঋষির ধ্যানে সেই নিত্য প্রেম ও আসক্তির প্রকৃত অনুভাব উদয় হইল। তিনি তাঁহাদের ধ্যানে মোহিত হইয়া গেলেন। তাঁহাদিগকে পূজা করিলেন। সেই প্রেম উৎসবে ঘোষিত হইল। জগতে উহা আদর্শ প্রেম বলিয়া প্রথিত হইল। তাহারই উৎসব মদনোৎসব। এই মদনোৎসব প্রাচীনকালে আর্য্যধামে এক মহাবাসন্তী উৎসব রূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল। আজি কাল-মাহাত্ম্যে তাহার ছায়া আছে মাত্র। এই মদনোৎসবই ফল্গূৎসব।

মদনোৎসবে ঋষির হৃদয় সাত্ত্বিক প্রেমে ঢল ঢল হইল। হৃদয় প্রেমে পূর্ণ হইল। সেই প্রেম-পূর্ণহৃদয়ে পরম পুরুষ উদয় হইলেন। কি মোহন বেশ! কি সুধার বংশীধ্বনি! মুরলীমোহন বংশী বাজাইতে বাজাইতে বঙ্কিমভাবে ঈষৎ দুলিতে দুলিতে হৃদয়ে দেখা দিলেন। দেখা দিবা মাত্র প্রেম গিয়া সেই পরম পুরুষে মিশিল। প্রেমের সাধনারূপিণী অষ্টসহচরী অনুরাগরূপ রাগ-

রঞ্জনে সেই হৃদয়ধাম সুরঞ্জিত করিল। হৃদয়ে শুধু প্রেমের মাখামাখি ও ছড়াছড়ি। বংশীর সুধারবে হৃদয়ের প্রতি তন্ত্র বাজিয়া উঠিল, কেবল হরি হরি ধ্বনিতে হৃদয় পরিপূর্ণ। হৃদয়ের পাপ তাপ তখন সকল তিরোহিত হইয়াছে। অন্তর্যামী হরি তখন নিজ সিংহাসন হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সেই সিংহাসনে তিনি প্রেমে নৃত্য করিতেছেন। হৃদয়-সিংহাসন দোদুল্যমান। হ্লাদিনী রাধা অনুরাগ কুঙ্কুমে সাধনার অষ্ট সহচরী সঙ্গে পুরুষোত্তমের দোলে মাতিয়া গিয়াছেন। কি সুন্দর ব্যাপার! কি মধুময় চিত্র! যে পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়াছিল, সেই পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় বসন্তকালের দেবদোল আর্য্যসন্তানগণের হৃদয় মাতাইয়া তুলিত। আর্য্য ঋষিগণ যেরূপে এই দেবদোলে মাতিয়াছিলেন, আমাদের হৃদয়ে কি তাহার কিছু উন্মত্ততা হয়? যাঁহাদের হয়, তাঁহারাই যথার্থ সার্থক। যাঁহারা সেই দেবদোল দেখিতে চান, তাঁহারা বসন্তকালে একদা রতি ও মদনোৎসবে মাতিয়া নিত্য প্রেমের ভাবে হৃদয়কে পরিপূর্ণ করুন। হৃদয়ে সেই সাত্ত্বিক প্রেমের সঞ্চার হইলে ক্রমে সাধনাবলে হৃদয়ের হ্লাদিনী শক্তি রাধারূপে প্রকটিত হইবে; রাধারূপে প্রকটিত হইলেই বংশীধর দেখা দিবেন। চাই কেবল সাধনা; চাই, কেবল ভক্তি ও প্রেম। তাহা হইলেই হৃদয় ব্রজপুরী হইবে।

আর্য্য-ঋষি তখন দেখিলেন, তাঁহার নিজ হৃদয়েই পরম পুরুষ বর্ত্তমান। তিনি তাঁহার মনের মন, আত্মার আত্মা, পরমসত্ত্ব পরমাত্মা। আর্য্য-ঋষি তাঁহার নাম দিলেন আত্মা বা পরমাত্মা। আর্য্য-ঋষির দ্বৈতভাব ক্রমে তিরোহিত হইতে

লাগিল। এই দ্বৈতভাব যেমন তাঁহার তিরোহিত হইতে লাগিল, অমনি তাঁহার হৃদয়ে অদ্বৈত ভাবের সঞ্চার হইতে লাগিল। হৃদয়ে তন্ময়তা জন্মিল। আজি আর্য্যধামে যে অদ্বৈতবাদ প্রচারিত আছে, তাহার সম্যক্ ভাব উপলব্ধি করিতে হইলে, ঋষিদের মত তন্ময়তায় উঠা চাই। সেই তন্ময়তায় উঠিতে না পারিলে, অদ্বৈতভাবের প্রকৃত অনুভব হওয়া অসম্ভব। এই ভাব, সাধনপ্রণালীর চরম সীমা। তাহা তর্ক নয়, যুক্তি নয়, সাধনার ফল মাত্র।

আর্য্য-ঋষি এখন বাহিরের বিশ্ব ছাড়িয়া দিয়া, নিজ আত্মধামের বিশ্বে আসিয়াছেন। তথায় দেবদোল্ করিলেন। পরম পুরুষের সাক্ষাৎকার পাইলেন। তাঁহাকে কৃষ্ণরূপে হৃদয়ে আঁকিলেন। সেই পরম পুরুষের ভাবে এখন ঢল ঢল হইয়া তাঁহাকেই ভাবিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার ঐশ্বর্য্য সাধারণ-হৃদয়ে প্রকটিত করিতে বাসনা হইল।

সাধারণ মানবহৃদয়ে সেই পরমাত্মা কেবল শক্তিরূপে প্রকটিত হন। শক্তিই সেই পরমাত্মার রূপ; এইরূপে তিনি জড় জগতে ব্যক্ত। সাধারণ মানবহৃদয় আর কোনরূপে পরমাত্মাকে অনুভব করিতে পারে না। আর্য্য-ঋষি তাই তাঁহাকে মহাশক্তিরূপে প্রদর্শন করিলেন। সমুদায় ঐশ্বর্য্যের সহিত তাঁহাকে দেখিলেন ও দেখাইলেন। সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণে পরিপূর্ণ হইয়া পরমাত্মা শক্তিরূপে প্রকটিত। এই শক্তিরূপী পরমাত্মা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের লীলায় লিপ্ত রহিয়াছেন। জগতের মহামায়ার অভ্যন্তরে তিনি আপনার লীলা সম্পাদন করিতেছেন। ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, বল, বীর্য্য প্রভৃতি তাঁহার বিভূতি। এই মহাশক্তির ধ্যানে ব্যাপৃত হইয়া

আর্য্য-ঋষি সকলকে নিজ নিজ হৃদয়ে তাঁহাকে বিভূতির সহিত দেখিতে পরামর্শ দিলেন। দশ দিকেই যে শক্তি বিস্তৃত, সেই মহাশক্তি দশভুজায় দেখা দিলেন। সেই দশভুজার পার্শ্বে, ঐশ্বর্য্য ও জ্ঞান, বল ও বীর্য্য; লক্ষ্মী সরস্বতী, গণপতি ও কার্ত্তিকেয়। এই মহাশক্তিকে আর্য্য ঋষি ধ্যানে দেখিয়া তাঁহার প্রতিমা প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিলেন ও সর্ব্বসাধারণকে করাইলেন। তাহাই বাসন্তী-পূজা বলিয়া জগতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

চৈতন্যরূপিণী।

ভক্তি সমস্ত বসন্ত-ছবিকে এইরূপ বসন্তোৎসবে প্রেমভক্তিময় করিয়া তোলে। যে প্রেমে সংসার বার বার নবীভূত হইয়া সৌন্দর্য্যে বিকশিত হইতেছে, সেই প্রেমলীলার ঐশ্বর্য্যময় বিকাশ বসন্ত। আজি সংসার পুরাতন ও মৃতপ্রায়, শীতে জর জর শীর্ণ কলেবর, যেন কেবল সৎস্বরূপ বর্ত্তমান; কাল সব নবজীবনে চৈতন্যময়—নবশোভায় সব রমণীয়। বসন্ত সেই সৎস্বরূপের চৈতন্যময় বিকাশ। এই বিশ্ব সেই চৈতন্যময় কৌশলজ্ঞ পুরুষের আনন্দময়ী লীলা। সৎস্বরূপ কভু চৈতন্যে পরিদৃশ্য, চৈতন্য কভু আনন্দলীলায় ব্যক্ত। সেই সচ্চিদানন্দের সমস্ত নিগূঢ় তত্ত্ব কে বুঝাইয়া দিবে? ভক্তিকে কে তত্ত্বজ্ঞানে লইয়া যাইবে? ভক্তি যখন এই ভাবে ভাবিত, তখন তাঁহার সেই প্রেমময়ী চৈতন্যরূপিণীরূপে দেখা দিলেন।

বীণাপাণি।

ভক্তি দেখিলেন, সেই চৈতন্যই সমস্ত সংসার ব্যাপিয়া আছেন, সেই চৈতন্যই সমস্ত সংসারের প্রাণ ও জ্ঞান। তাঁহাতেই শক্তি,

জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য সকলই বর্ত্তমান। তখন ভক্তির যে জ্ঞানোদয় হইল, সেই জ্ঞানে তিনি চৈতন্যরূপিণীকে পূজা করিতে গেলেন। কল্পনা জাগরিত হইয়া দেখিল, প্রেমময়ীর করকমলে বীণা। * জ্ঞানদায়িনী, চৈতন্যময়ী, কিরীটিনী, পদ্মাসনা বীণাপাণির মুখমণ্ডলে বাসন্তী মাধুরী। কুঞ্জকাননের কূজনরবে বীণা ঝঙ্কারিত হইতেছে। ভক্তি সেই মধুর রবে বীণাপাণির স্তোত্ররব মিশাইয়া দিলেন। ভক্তির বীণাপাণি জগতে সরস্বতীরূপে প্রকাশিত হইলেন।

কে বলে স্পর্শমণি অলীক পদার্থ? জগতে স্পর্শমণি যদি কিছু থাকে, তবে তাহা নিশ্চয় কবির হৃদয়। কবির হৃদয় ধূলিকেও স্বর্ণময় করে। আর স্পর্শমণি ভক্তি। ভক্তি, মৃত্তিকাকেও দেবত্বে লইয়া যায়। কবি-কল্পনার সহায়তায় ভক্তি—বন, উপবন, নদ, নদী, পর্ব্বতগহ্বর ও সমস্ত জগৎ দেবদেবীতে পরিপূর্ণ করে। মৃণ্ময়ী সরস্বতী আজ ভক্তির স্পর্শে দেবীরূপে বঙ্গধামে উদয় হইয়াছেন। ঋতুরাজ বুঝি দেবীকে পূজা করিতেছেন! বঙ্গদেশ সেই পূজায় মাতিয়া গিয়াছে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার ভক্তিতে সরস্বতীদেবী রমণ করিতেছেন। ভক্তির মনে বালকগণ তাঁহাকে আরাধনা করিতেছে—তাঁহার পদকমলে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছে। তদ্‌সঙ্গে কুলবধূ, গৃহিণী, যুবা, যুবতী, বৃদ্ধ—সবাই সমভক্তিতে দেবীকে পবিত্রমনে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছে। জ্ঞানময়ীর পদতলে সমস্ত পাণ্ডিত্য, জ্ঞান ও শাস্ত্র সমর্পণ করিয়াছে।

---

* ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ-মতে বাগ্‌বাদিনী সরস্বতীদেবী বৈকুণ্ঠধামে প্রেমময়ী কৃষ্ণযোষিৎ প্রকৃতি সুন্দরীর জিহ্বাগ্র হইতে সমদ্ভূতা।

সমর্পণ করিয়া সুন্দরীকে দেবজ্যোতিঃতে আরও সুন্দরতর দেখিয়া তাঁহার বন্দনা করিতেছে। সে বন্দনার পদাবলী মুক্তামালার ন্যায় গ্রথিত। জয়দেব তেমন সুন্দর পদাবলী দিতে পারিতেন কি না, সন্দেহ।

শ্রীকৃষ্ণ যে মোহন বনবিহারিরূপে বৈষ্ণব-কল্পনায় সমুদিত, সরস্বতীর মূর্ত্তিতে ততোধিক সৌন্দর্য্য। তত্ত্বজ্ঞানের সেই প্রেম-মুগ্ধ বঙ্কিমভাব। শিরে, মোহনচূড়ার পরিবর্ত্তে উজ্জ্বল কিরীট। করে বংশীর স্থলে বীণা। উভয়েরই গাত্রে জ্বলদগ্নিশিখাসম পীতাম্বর এবং পদতলে শতদল শোভিত। বিষ্ণুর শ্বেতবরণে দেবী মনোহরা। শ্বেতাঙ্গিনীর সমস্ত অঙ্গ উৎকৃষ্ট রত্নভূষণে ভূষিত। মুখে উভয়েরই হাস্যবিকাশ। মা বলিয়া ডাকিতে না পারিলে ভক্তি বুঝি পরিতৃপ্ত হয় না, তাই নারায়ণ দেবীরূপ ধারণ করিয়াছেন। আর ভক্তি তাঁহার পদতলে উপহার দিতেছে কি? সমস্ত শ্বেতবর্ণ সামগ্রী—সুগন্ধি-শ্বেতপুষ্প, শ্বেতচন্দন, শ্বেতবর্ণ নববস্ত্র, মনোহর শঙ্খ, শ্বেতপুষ্পের মালা, শুক্লবর্ণের হার এবং শুক্লবর্ণ ভূষণ।*—এ যে পুণ্যের প্রতিমা, পবিত্রতার পূজা, চন্দ্রমার পরিবেশ, প্রকৃতির মায়া, কুসুমিত বসন্ত, বিকশিত বৃন্দাবন।

যেখানে জ্ঞানদীপ জ্বলিতেছে, সে স্থান সেই জ্ঞানালোকে সমস্ত শুভ্রময়। যেখানে তত্ত্বজ্ঞান উদয়, সেখানে সকলই পবিত্রতাময়। এই সৌন্দর্য্য বীণাপাণির রূপে ও পূজায়। † যে

* ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণান্তর্গত প্রকৃতি খণ্ডের ৪র্থ অধ্যায়ের ৪৪ শ্লোক দেখ।

† ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ বলেন, "সরস্বতীর পূজা প্রথমে শ্রীকৃষ্ণই সংস্থাপন করেন। ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, অনন্ত, ধর্ম্ম, মুনিগণ, দেবগণ ও

কল্পনা বীণাপাণির রূপ সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার সৌন্দর্য্যানু-ভাবুকতার সম্যক্ প্রশংসা করা যাইতে পারে না। সমস্ত বাসন্তী মাধুরী ও কান্তি, সমস্ত পবিত্রতা ও শান্তি, সমস্ত সৌকুমার্য্য ও শোভা একত্রিত করিয়া বুঝি সরস্বতীর রূপ গঠিত হইয়া থাকিবে। যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি হওয়া যায়, সেই ব্রহ্মাণ্ডকমল ভারতীর পদতলে প্রস্ফুটিত। দেবী ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরী হইয়া তাহার সমস্ত ঐশ্বর্য্যে ভূষিতা হইয়াছেন। সেই ঐশ্বর্য্যসম্পন্না, জ্ঞানালোক-উদ্ভাসিতা, পরম পবিত্রতাময়ী সুন্দরীর কোমল করপল্লবে বীণা ব্যতীত আর কি ভূষণ শোভা পাইতে পারে? শব্দ-ব্রহ্মরূপিণী বেদমাতার উপযুক্ত যন্ত্র বীণা। সেই বীণারবে দেবী ব্রহ্মাণ্ডময় বেদগানে ও ব্রহ্মসংগীতে পূর্ণ করিতেছেন। যে ব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ডময় ব্যাপ্ত, তাঁহার পত্নী হইয়া তিনিও ব্রহ্মাণ্ডময়ী * হইয়াছেন। তত্ত্বজ্ঞানে ব্রহ্মকে ব্রহ্মাণ্ডময় দেদীপ্যমান দেখিয়া তাঁহারই গুণকীর্ত্তনে অনন্তদেশ সঙ্গীতময় করিয়াছেন। সেই গানে মোহিতা দেবী ঈষৎ বঙ্কিমভাবে অবস্থিতা। তত্ত্বজ্ঞানী সদাই তত্ত্বজ্ঞানে বিভোর হইয়া আছে।

মনুষ্য প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে পূজা করিয়া থাকেন। তাঁহার উপযুক্ত নৈবেদ্য বেদে বর্ণিত হইয়াছে। এই নৈবেদ্য প্রদান করিয়া বেদবিহিত ধ্যান ও মন্ত্রে কৃতস্নাত হইয়া ভক্তিযোগে তাঁহার পূজা করিতে হইবে।" শুক্ল যজুর্ব্বেদে এই পূজা-পদ্ধতি, ধ্যান ও মন্ত্রজপ বর্ণিত হইয়াছে। যাহা বেদে নাই, তাহা হিন্দুশাস্ত্র নহে। দেবদেবীর পূজাপদ্ধতি সমস্তই বেদ-বিহিত।

* ব্রহ্ম এক বই দুই নহে; দেবদেবী তাঁহার আংশিক বিকাশ বা অবতার মাত্র।

বাগ্দেবী।

সরস্বতী আবার বাগ্দেবী কল্পনাময়ী। বাগ্দেবীর শব্দলহরী সুস্বনে ধ্বনিত। সেই সুস্বর-সুধা তাঁহার বীণাবাদনে উৎসারিত। কবির কল্পনা-সৌন্দর্য্য সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী। তিনি কল্পনাবলে ব্রহ্মাণ্ডময় ভ্রমণ করেন। কবি কোথায় না গমন করেন? কল্পনাসহকারে ব্যাস ও বাল্মীকি স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল পর্য্যটন করিয়া আসিয়াছেন; দ্যুলোক, ভূলোক, গোলোক, ব্রহ্মলোক, চন্দ্রলোক, সূর্য্যলোক প্রভৃতি অযুত লোক ভ্রমণ করিয়া সেই সমস্ত লোকের সৌন্দর্য্য ও কান্তি পুরাণময় ছড়াইয়া দিয়াছেন; দিব্যলোকের শোভা দিব্যগানে বীণার মধুর স্বরে বাদন করিয়াছেন। তাই কল্পনাদেবী ব্রহ্মাণ্ডে দণ্ডায়মানা হইয়া বীণাবাদনে মোহিতভাবে অবস্থিতা। যে শতদলে কল্পনাময়ী বাগ্দেবী স্থাপিতা, * তাহা কি ব্রহ্মাণ্ড-কমল? না—কবি-হৃদয়ের পদ্মাসন?

---

* ঋগ্বেদে সরস্বতী "বাক্" রূপে উক্ত হইয়াছেন। মোক্ষমূলর তৎসম্বন্ধে বলেন :—"We find in the ঋগ্বেদ a hymn placed in the mouth of বাক্ which is unintelligible unless we admit a long previous growth of thought during which বাক্ had become not only one of many dities, but a kind of power even beyond the Gods, a kind of Logos or primeval Wisdom." তিনি আরও বলে· "When we come to the Brahmanas, we find there also many passages which would become intelligible, if we might take Vak or Speech in the sense of the Jewish Wisdom Prov.

কল্পনাময়ী।

কল্পনাদেবী কবির হৃদয়বাসিনী। কল্পনাদেবীর নিত্য সুখের ধাম, কবির হৃদয়। সেই কবির হৃদয়ে সরস্বতী নন্দনকানন বিরচন করিয়া সর্ব্বক্ষণ বাস করিতেছেন। সে কাননে অন্ধকার নাই, রাত্রি নাই—সর্ব্বদাই পূর্ণশশীর চন্দ্রিকা। সে বনে বসন্ত নিত্য বিরাজিত। মধুর স্বরে কল্পনাদেবী নিত্য গীত গাইতেছেন। নিত্য নব-কমল চারিদিকে প্রস্ফুটিত হইতেছে; নব নব দিব্য-কুসুম পারিজাত-সৌন্দর্য্যে নিত্য শোভিত হইতেছে। তাই, কল্পনাদেবী সরস্বতীর চারিপার্শ্বে কমলদল বিকশিত রহিয়াছে। তাঁহার রূপে কবিত্বচন্দ্রিকার আভা ফুটিয়াছে। তাঁহার অঙ্গে কাব্য-কাননের নানা কুসুমমালা শোভিত রহিয়াছে। দেবী চারিদিকেই সৌন্দর্য্যরাশি বিকীর্ণ করিয়া কবিহৃদয়ের পদ্মাসনে বিরাজিতা রহিয়াছেন।

কবি-হৃদয়ের নন্দনকাননে যে সমস্ত কল্পতরু কুসুমিত, সেই তরুরাজি সুধারসে নিত্য-সেবিত। সে কাননে নবরসের উৎস সদাই উৎসারিত হইতেছে। সেই নবরসের সরসীতে যে কাব্য-কমল প্রস্ফুটিত, সেই কাব্য-কমলে বীণাপাণি বীণাবাদন করিতে-ছেন। তাঁহার চারিদিকেই বসন্তরাগ-রঞ্জিত ভাবের কুসুমাবলী প্রস্ফুটিত হইয়াছে। অনুরাগ-হিল্লোলে, প্রেমের মধুরতায় মলয়া-নিল নিত্য সুধা সঞ্চারিত করিতেছে। ভারতী সেইভাবে ভোর; কবির হৃদয়রসে নিমগ্না হইয়া রহিয়াছেন। মাধুরী তাঁহার

VIII 22. A similar strain of thought meets us in the পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ, ১০—১৪—২।"

লাবণ্যে ঝরিয়া পড়িতেছে। বাসন্তীসরসী-কমলে কমলদলবাসিনী-রূপে কবি এই হৃদয়বাসিনী ভারতীরই প্রতিবিম্ব দেখিয়াছিলেন।

গীতি-শক্তি।

আর সঙ্গীত! তোমার মধুময় সুরলহরীতে কি জগৎ মুগ্ধ নয়? তাই গীতিদেবী জগতের কমলদলে আসীনা হইয়া সঙ্গীতে সমস্ত জগৎ মোহিত করিতেছেন। আর কথক, বাগ্মী, তোমরা কোন্ শক্তি-প্রভাবে জগৎকে মোহিত কর? তোমাদের সেই বাক্যের স্রোত—সেই কল্পনার সৃষ্টি—সেই সুস্বর ও মধুর ধ্বনি—সেই রসময়ী বর্ণনা—সেই সমস্ত কি সংসারকে মোহিত করে না? কিন্তু সে সমস্তের দেববল কি? সে সমস্তের মহাশক্তি জ্ঞানরূপিণী বাগ্দেবী সরস্বতী—সেই জ্ঞান, যে জ্ঞান ভক্তিরসে অভিষিক্তা—সেই জ্ঞান, যে জ্ঞান বাল্মীকি ও ব্যাসের সঙ্গীতে প্রচারিত, যে জ্ঞানে ত্রিজগৎ মোহিত, যে জ্ঞান বসন্তের মাধুর্য্যময় রসে পরিপূর্ণ—সেই দেব-জ্ঞানময়ী সরস্বতী বাগ্দেবী বীণাপাণি।

তপস্বিনী।

সরস্বতী দেবীর মূর্ত্তিকল্পনায় এতই সৌন্দর্য্য ও মাধুরী! সে কল্পনায় এক নিগূঢ়তত্ত্ব নিহিত আছে। দেবী শুধু যে জ্ঞান-দায়িনী, বাগ্বাদিনী, কল্পনাময়ী এমত নহে, তিনি আবার বরদায়িনী তপস্যাস্বরূপা। তিনি নিজে তপস্বিনী এবং যাঁহারা তপোনুষ্ঠানে রত, তাঁহাদিগের ফলদাত্রী। এইরূপে দেবী করে

রত্নমালা লইয়া সতত জপপরায়ণা হইয়া আছেন।* জপ করিতে-ছেন পরমাত্মস্বরূপকে।

কৈবল্য-দায়িনী।

বিদ্যা তপস্বিনী। বাস্তবিক তপস্যা যদি কাহারও থাকে, সে কেবল বিদ্যার আছে। তেমন উগ্র তপঃ আর কাহারও নাই। অপরের তপস্যার শেষ আছে, বিদ্যার তপস্যার শেষ নাই। সেই যে শৈশব হইতে আরম্ভ করিয়াছে, সে তপের বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, বরং উত্তরোত্তর বাড়িতেছে, বয়োবৃদ্ধি সহকারে বাড়িতেছে। বাড়িবে কতকাল? যতদিন না শেষের সে ভয়ঙ্কর দিন উপস্থিত হয়। কিন্তু এ তপস্যায় সুখ আছে, সুখ আছে তাই তাহার বৃদ্ধি। যত বৃদ্ধি তত সুখ। এ তপের প্রারম্ভই কঠিন। এ তপের জন্য চাই কি?—না, বুদ্ধি, প্রতিভা, ধারণা, কল্পনা ও স্মৃতিশক্তি—সরস্বতীর পূর্ণাবয়ব। যিনি শৈশবে কিয়দংশ স্বাভাবিকী প্রতিভা না লইয়া আসিয়াছেন, তাঁহার বিদ্যালাভ হওয়া দুঃসাধ্য। এজন্য লোকে কথায় বলে, পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত সংস্কার না থাকিলে বিদ্যালাভ হয় না। এই প্রতিভা লইয়া বিদ্যার তপোযোগ আরম্ভ করিলে, বুদ্ধি, মেধা, কল্পনা, স্মৃতি পরে সহায়তা করিতে থাকে। সহায়তা করিয়া অনুরাগকে আনিয়া দেয়। যখন অনুরাগ ও প্রেম আসিয়া উপনীত, তখন তপস্যা রসযুক্ত হয়। লোকে বিদ্যা-রসাস্বাদনের সম্ভোগী হইলে

---

* হিমচন্দনকুন্দেন্দুকুমুদাম্ভোজসন্নিভা।
জপন্তী পরমাত্মানং শ্রীকৃষ্ণরত্নমালয়া॥
—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ১ অধ্যায়, প্রকৃতিখণ্ড।

আর তপস্যার বিরাম নাই। তপস্যা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। সেই তপোবৃদ্ধিতে লোকের ঐশ্বর্য্যলাভ। বিদ্যাদ্বারা কোন্ ঐশ্বর্য্য না লব্ধ হয়? পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ ও সুখ বিদ্যাবলে অর্জ্জিত হয়। সরস্বতীর সহিত লক্ষ্মীর এইরূপে মিলন হয়। তখন বিদ্যাদেবী সর্ব্বার্থ-সাধিকা ও সর্ব্বকামনা-সিদ্ধিদাত্রী। * কিন্তু এই সম্পদ ও সুখ কখন স্থায়ী হয়? যখন তাহার সহিত ভক্তি মিশে। যখন বিদ্যার সহিত ভক্তি মিশে, তখন বিদ্যা বেদের দিকে অগ্রবর্ত্তিনী হন, তখন লক্ষ্মীদেবী সরস্বতীকে সর্ব্বসম্পদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সম্পদ আনিয়া দেন। সরস্বতী ও লক্ষ্মী একত্র অগ্রসারিণী হইয়া বেদাধিষ্ঠাত্রী সাবিত্রী দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। যখন সাবিত্রীর সহিত সরস্বতী দেবীর মিলন হয়, তখন কৈবল্যদায়িনী দুর্গার সহিত সরস্বতীর সাক্ষাৎকার। সেই সাক্ষাৎকারে বিদ্যা কৈবল্য লাভ করে।

মূল প্রকৃতিদেবীকে এজন্য আমরা এই পঞ্চবিধ রূপে দেখিতে পাই। মূল প্রকৃতি—জ্ঞান, ভক্তি, ঐশ্বর্য্য, পরমার্থ ও ব্রহ্ম। সরস্বতীর জ্ঞান, রাধিকার ভক্তি, লক্ষ্মীর ঐশ্বর্য্য, সাবিত্রীর পরমার্থতত্ত্ব-বেদ এবং দুর্গার কৈবল্যময় ব্রহ্মত্ব। অথবা পরব্রহ্ম, পরমার্থতত্ত্ব বেদের পরম পুরুষ। পরম পুরুষ, ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যে প্রকাশিত। ঈশ্বর, ভক্তি ও জ্ঞানে লব্ধ। পুরাণে মূল প্রকৃতির এই পঞ্চবিভাগ বর্ণিত হইয়াছে। † মূল প্রকৃতি-দেবীর এই

---

* হিন্দুর কামনা ধর্ম্মের জন্য; ধন, মান হিন্দু কামনা করেন ধর্ম্মের জন্য। ধর্ম্মের জন্য হিন্দু সকাম। তাঁহার যশ ধর্ম্মের যশ।

† তদাজ্ঞয়া পঞ্চবিধা সৃষ্টি কর্ম্মনি ভেদতঃ।
অথ ভক্তানুরোধাদ্বাভক্তানুগ্রহ বিগ্রহ।
—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড, ১ অধ্যায়।

পঞ্চবিভাগ বাসন্তী পূজায় প্রকটিত হইয়াছে। বাসন্তী দুর্গাপূজায় আমরা যখন প্রকৃতি-দেবীকে পূজা করি, তখন সেই মূল প্রকৃতি যে সৎস্বরূপ পুরুষের আশ্রিতা, তাঁহাকেই পূজা করি। পূজা করি বাসন্তী মধুরতায়। শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতী ও দোলে রাধিকার পূজা অগ্রে করিয়া যে জ্ঞানোদয় ও ভক্তিরস সঞ্চারিত হয়, সেই জ্ঞানোদয়ে ও ভক্তিতে সমগ্র ভগবচ্ছক্তিকে একত্র পূজা করিয়া বাসন্তী উৎসব পরিশেষ করি।

নারায়ণী।

নিজে সরস্বতীদেবী ভক্তিময়ী নারায়ণী—শ্বেতবর্ণা বিষ্ণুরূপিণী। দেবী শুধু ভক্তিময়ী নহেন, তিনি আবার সৃষ্টিরূপিণী ব্রহ্মার পত্নী। * যেখানে অনুরাগ নাই, সেখানে বিদ্যা নাই। সেই প্রেম ক্রমশঃ বিষ্ণু-ভক্তিতে পরিণত। জ্ঞানের সহিত মিশিয়া তাহা বিষ্ণু-ভক্তিতে পরিণত হয়। বিষ্ণু-ভক্তির সহিত জ্ঞান যখন মিশে, তখন জ্ঞান পরমার্থরসে মগ্ন হয়। সেই পরমার্থ-রসমগ্না সরস্বতী দেবী তপস্বিনী—তপস্বিনী ব্রহ্মময়ী—ব্রহ্মধ্যানমগ্না। নারায়ণী ভক্তিরূপিণী ব্রহ্মধ্যানমগ্না জ্ঞানযোগিনী। সেই সরস্বতীতে আমরা একাধারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরকে দেখিতে পাই। ব্রাহ্মীশক্তি মহাকর্ম্মদেবী, বিষ্ণুরূপিণী মহাভক্তিরূপা, আর মহাজ্ঞানময়ী সরস্বতী জ্ঞানযোগিনী মহেশ্বররূপা। সরস্বতীর কল্পনায় আমরা কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানযোগের একত্র সমাবেশ দেখি। সরস্বতী দেখাইতেছেন, কর্ম্ম ও ভক্তিযোগ একত্র মিশিয়া মহা জ্ঞানযোগে আরোহণ করে। জ্ঞানযোগে আরোহণ করিলে সর্ব্বার্থ-

* ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ-মতে সরস্বতী ব্রহ্মার পত্নী।

সিদ্ধি হয়। তখন কৈবল্যদায়িনী দুর্গা আপনি কৈবল্য আনিয়া দেন। জীব মুক্ত হয়।

জ্ঞানদায়িনী।

ব্রহ্মা যে মহাসৃষ্টি-ব্যাপারে ব্যাপৃত, তাহাতেই তিনি মহা কর্ম্মযোগী। সেই কর্ম্মযোগীর পত্নী মহাকর্ম্মদেবী। জ্ঞানের সহায়তায় আমরা ব্রহ্মার সৃষ্টিব্যাপার অবলোকন করি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, সকলই আমাদের জ্ঞানাকারে আবির্ভূত। এ জগৎ কেবল আমাদের জ্ঞান-জগতে বর্ত্তমান। আমাদের জ্ঞান-চক্ষু না থাকিলে আমরা কিছুই দেখিতে পাইতাম না। এ বিশ্ব কেবল জ্ঞানেরই সৃষ্টিকাণ্ড। সরস্বতীর সৃষ্টি, জ্ঞানের মহাসৃষ্টি-ব্যাপার। ব্রহ্মার বিরাট সৃষ্টি, কেবল বিজ্ঞানময় সৃষ্টিব্যাপারে প্রতীত। মহাজ্ঞানী কপিল এই ব্যাপারের বিকাশ দেখাইয়া জগতে পরম পুরুষকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি এই বিচিত্র বাহ্য-বিশ্বধামে এক জ্ঞানময় জগৎ দেখাইয়াছেন। সরস্বতী সেই জ্ঞানময় জগতের সৃষ্টি-কারিণী। সেই জ্ঞানময় জগতের সৃষ্টি আছে বলিয়া আমরা ব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করি এবং তৎসঙ্গে ব্রহ্মাণ্ডপতিকে দেখিতে পাই। দেখিতে পাই কোথায়? সেই জ্ঞানময় জগতের অভ্যন্তরে। পরম পুরুষ জ্ঞানের অনুভবে অনন্ত চৈতন্যরূপে ব্যক্ত হন। তখন আমরা সেই অনন্ত চৈতন্যদেবকে হৃদয়ের ভক্তি-রাজ্যে অধিষ্ঠিত করি। হৃদয়ে কৃষ্ণাবির্ভাব ঘটে। নারায়ণী নারায়ণকে আনিয়া দেন। হৃদয়ের মহা আনন্দধামে,—নন্দালয়ে নারায়ণকে অধিষ্ঠিত করিয়া তবে তাঁহাকে দেদীপ্যমান দেখিতে থাকি। যে জ্ঞানময় সৃষ্টিপ্রভাবে আমরা এই নারায়ণের আবি-

র্ভাব দেখি, তাহাই ব্রহ্মার পত্নী সরস্বতীদেবীর মহা সৃষ্টিকাণ্ড। ব্রহ্মার সৃষ্টির মধ্যে এই জ্ঞানময় সৃষ্টি মিশিয়া আছে। দিব্য-জ্ঞানে তাহা প্রতীত হয়। সরস্বতী ব্রহ্মে লীনা হইয়া আছেন। পুরুষে প্রকৃতিসুন্দরী অব্যক্তভাবে অবস্থান করিতেছেন। সরস্বতী, সূক্ষ্ম ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর রূপ পরব্রহ্মেরই বাহ্যবিকাশ মাত্র মহেশ্বরে যে মহা জ্ঞানযোগ বর্ত্তমান, যে জ্ঞানযোগে সেই মহা-যোগী সততই ধ্যানমগ্ন, সরস্বতী-দেবী সেই জ্ঞানের প্রতিমা। যিনি সরস্বতীকে পূজা করেন ; তিনি কর্ম্মময় ব্রহ্মা, ভক্তিময় বিষ্ণু এবং জ্ঞানময় মহেশ্বরকে পূজা করিয়া ; তিনি পরম পুরুষকে পূজা করেন। সরস্বতী দেবী সেই পরম পুরুষের রূপান্তর মাত্র। আইস, আমরা সকলে সরস্বতীর পূজা করি। পূজা করিয়া জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মযোগে মহা সংসারলীলায় পরম পুরুষকে সর্ব্বঘটে বিদ্যমান দেখি।

অলঙ্কারময়ী।

সরস্বতী দেবী যে অলঙ্কারদামে ভূষিতা, দেবতারা তাঁহাকে সেই ভূষণরাশি বিতরণ করিয়াছেন। ব্রহ্মা ভারতীকে রত্নেন্দ্র-সার-বিনির্ম্মিত উৎকৃষ্ট হার ও সর্ব্ব-ব্রহ্মাণ্ড-দুর্লভ শিরোরত্ন প্রদান করিয়াছেন। সেই হার, মুক্তা, মাণিক্য, মরকত, ইন্দ্র-নীল ও হীরকমালায় গ্রথিত। সেই পঞ্চরত্ন চতুর্ব্বেদ ও গায়ত্রী-স্বরূপ। সেই হারে ভূষিতা হইয়া সরস্বতী বেদমাতা ও গায়ত্রী স্বরূপা। সেই হার সরস্বতী দেবীর পঞ্চশক্তির বিকাশ—বুদ্ধি স্মৃতি, প্রতিভা, কবিত্ব ও ধারণাশক্তি। সে হার পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চ মহাভূত-পংক্তিরূপ পঞ্চরত্নে রচিত। সেই হারে ভূষিতা হইয়া

দেবী প্রজাপতির সৃষ্টি-ব্যাপারে সংলিপ্তা। ব্রহ্মা যে শিরোরত্ন দিয়াছেন, তাহা কিরীটস্থ সৎরূপ শ্রেষ্ঠ পদার্থ। এই ভূষণদ্বয়ে সরস্বতী দেবী ব্রহ্মরূপিণী। তাহাতেই তাঁহার ব্রহ্মত্ব। শ্রীকৃষ্ণ বাণীকে সর্ব্বরত্ন-প্রধান কৌস্তুভরত্ন দিয়াছেন। এই কৌস্তুভরত্ন বাক্যের তেজঃস্বরূপ এবং নির্গুণ, নির্লেপ, অমল আত্মা। এই ভূষণে সরস্বতী অমলতা এবং ব্রহ্মতেজস্বিতায় সম্পন্না হইয়াছেন। রাধিকা তাঁহাকে অমূল্য প্রেমহারে ভূষিতা করিয়াছেন। এই হার-প্রভাবে সৎস্বরূপা ব্রাহ্মীশক্তি জগৎপ্রেমে ও বিষ্ণুপ্রেমে মুগ্ধা। সনাতন নারায়ণ তাঁহাকে মনোহর বনমালা দান করিয়াছেন। সিদ্ধগণের হৃদয়স্থ ভক্তিপুষ্পমালা চয়ন করিয়া নারায়ণ এই হার গাঁথিয়াছেন। যে ভক্তি ব্যতীত তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না, সেই ভক্তি পুষ্পমালা সরস্বতী-কণ্ঠে। লক্ষ্মীদেবী অমূল্য রত্ন-নির্ম্মিত মকরকুণ্ডলদ্বয় তাঁহার কর্ণভূষণ করিয়া দিয়াছেন। এই কুণ্ডলদ্বয় স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক ঈশ্বরের বিভূতিস্বরূপ। ভগবতী, সরস্বতীকে বিষ্ণুভক্তি দিয়াছেন। ধর্ম্ম, বাগ্দেবীকে ধর্ম্মবুদ্ধি ও বিপুল যশস্বরূপ অগ্নিশুদ্ধ পবিত্রতার বসনে ভূষিতা করিয়াছেন; আর বায়ু তাঁহাকে প্রীতিপূর্ব্বক মণিময় নূপুর অর্পণ করিয়াছেন। সেই নূপুর-ধ্বনিতে দেবী সঙ্গীতময়ী হইয়া রহিয়াছেন। *

* ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণস্থ প্রকৃতিখণ্ডের দশম অধ্যায়ে এই সমস্ত ভূষণের কথা উল্লিখিত আছে। সরস্বতীদেবী, যে সমস্ত দেবভাবে কল্পিত, এই ভূষণ সকল সেই দেবত্ব। এই সমস্ত অলঙ্কারের ব্যাখ্যা বিষ্ণুপুরাণান্তর্গত ১ অংশের দ্বাবিংশ অধ্যায়, গোপালতাপনীয় উপনিষৎ এবং অন্যান্য শাস্ত্র হইতে সংগৃহীত হইল। যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত কাণ্ব শাখায় সরস্বতীর ধ্যান ও স্তব লিখিত হইয়াছে।

ভক্তির গৌরব।

জ্ঞান দ্বারা আমরা কেমন ব্রহ্মতত্ত্বে উপনীত হই, তাহা বোধ হয় এক্ষণে প্রতীত হইতেছে। সরস্বতীদেবীর জ্ঞানময় সৃষ্টিকাণ্ডে ব্রহ্ম অধিষ্ঠিত হন। জ্ঞান, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতরতত্ত্বে উপনীত হইতে পারে। সরস্বতী দেবী সেই জ্ঞান ও বিচারে বাগ্বাদিনী। তিনি জ্ঞানযোগময়ী। সেই জ্ঞানযোগে তিনি পরব্রহ্মকেও অনুভবে উপলব্ধি করিতে পারেন। কিন্তু যাহারা জ্ঞানবিরহিত অজ্ঞ; যাহাদের প্রতি সরস্বতীর কৃপা নাই; যাহাদের বুদ্ধি, প্রতিভা স্মৃতি, মেধা ও কল্পনা তত তেজস্বিনী নহে, অথবা যাহারা সেই শক্তি সমূহের বিকাশ সাধন করিতে পারে না; যাহারা বিদ্যালাভে অসমর্থ, সেই অগণ্য লোকের গতি কি? তাহাদের বুদ্ধির বিকাশ না হইলে কি হয়? তাহাদের প্রেম আছে, দয়া আছে, ধর্ম্ম আছে, ক্ষমা আছে, শ্রদ্ধা আছে, অনুরাগ আছে, এবং ভক্তি আছে। ভক্তি থাকিলেই যথেষ্ট। ভক্তির হৃদয়রাজ্যে নিজে হরি বিচরণ করেন। ভক্তির সাধনায় ভগবান্ দেখা দেন। জ্ঞানের ব্রহ্ম, ভক্তির ভগবান্। ভক্তি ব্যতীত উপাসনা নাই; উপাস্য দেবতা ভগবান্।

সরস্বতীর পূজায় যে ভক্তিরসের সঞ্চার হয়, শৈশব হইতে সেই ভক্তির পরিপুষ্টি হইতে থাকে। বসন্তকালে জ্ঞানীর ভক্তি ক্রমশঃ স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে। জ্ঞানী, বাসন্তী-সৌন্দর্য্য মাঝে প্রেমের পরিচয় পাইয়া উল্লসিত মনে ভক্তির পথ বিমুক্ত করিয়া দেন। তখন ভক্তি প্রবলা হইয়া মনকে উদ্বোধিত করিতে থাকে। ভক্তি যেমন জ্ঞানকে প্রথমে দেবতুল্য করিয়া-

ছিল, তেমনই এখন জ্ঞান ক্রমশঃ ভক্তিকে দেবতুল্য করিতে চলিল। জ্ঞানের উদ্রেকে হৃদয় বুঝিল, ভক্তি নিজেই দেবতা ও পবিত্রতাময়ী; তাই তাঁহার সংস্পর্শে সকলই পবিত্র হইয়া যায়। যে হৃদয় ভক্তিতে পরিপূর্ণ, সেই হৃদয়ই পরমানন্দধাম। যে আনন্দ ভক্তিতে—মুক্তি সেই আনন্দের প্রয়াসিনী। পরা-ভক্তি নিত্য আনন্দময়ী প্রকৃতি-দেবী। ভক্তি অমৃতস্বরূপ, তাহার মুক্তি-পিপাসা নাই। মুক্তি তাহার দাসী। ভক্তিকে পাইলে মানুষের সকল তৃষ্ণা, শোক ও দ্বেষ বিদুরিত হয়। ভক্তিকে পাইলে মানুষের সকল সম্পদ লাভ হয়। রাজ-সিংহাসনও তুচ্ছ বোধ হয়। যে জ্ঞানে এই ভক্তির উদয় না হয়, সে জ্ঞান নিশ্চয় বৃথা জ্ঞান। বসন্তের সৌন্দর্য্য দেখিয়া যদি হৃদয়ে ভক্তির উদ্রেক না হয়, তবে সে হৃদয় নিশ্চয় অপবিত্র। বাসন্তী-কান্তি মানুষকে কবি করিয়া তোলে, ভক্তি কবিকে উন্মত্ত করিয়া দেয়। সেইরূপ উন্মত্ত কবি জয়দেব।

জয়দেব।

উন্মত্ত জয়দেবের মনে ভক্তি অতি মধুরভাব ধারণ করি-য়াছে। জয়দেব বৈষ্ণবানুরাগের বাসন্তী-বিকাশ। বসন্তের যে উল্লাস, নবজীবনের যে উৎসাহ, প্রেমের যে মুগ্ধতা, সে সমস্তই একত্রিত হইয়া জয়দেবের সরস হৃদয়কে মুঞ্জরিত করিয়াছে। সেই গুঞ্জরিত কুসুম—শ্রীমতী রাধিকা। জয়দেবের রাধিকায় যে অনুরাগ, যে ঐকান্তিকতা, যে উন্মত্ততার সহিত বাসন্তী মধুরতা, ততোধিক বুঝি আর কোথাও নাই। বাসন্তীরাগে রাধিকা উৎসাহিতা, উল্লসিতা। ঐকান্তিক কৃষ্ণ-ভক্তিতে রাধিকা আত্ম-

হারা, মাতোয়ারা। তাঁহার প্রেম, পতিপত্নীর ঘনিষ্ঠ প্রেম। তাঁহার আসক্তি—কান্তাসক্তি—প্রেমিক ও প্রেমিকার আসক্তি—তাই মধুর। সেই মধুরভাবে রাধিকা কোমলতায় পরিপূরিতা। সরস বসন্তের সর্ব্বদেশে রাধিকা পরম আনন্দময় ও রসময়কে যেন স্বপ্নবৎ জাজ্বল্যমান দেখিতেছেন। আনন্দের ছবি তাঁহার মানসে সতত উদিত হইতেছে। সেই আনন্দময়ে মিশিবার জন্য রাধিকা পাগলিনী। তাই বসন্তকালের শোভাময় দেশে বৃন্দাবন প্রস্ফুটিত দেখিয়া আত্মহারা-প্রায় ভক্তিরূপা রাধাসুন্দরী পরম আনন্দময়কে খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। স্থূলরূপা আরাধনা-দেবী স্থূলরূপ আনন্দময়কে অন্বেষণ করিতেছেন। ভক্তির পিপাসা অমৃতের জন্য লালায়িত; সেই পিপাসা বসন্তকালে দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিয়াছে। যে আনন্দময় রাধিকার অন্তরে ও ধ্যানে—ভক্তের হৃদয়ে—সর্ব্বদাই জাগিতেছে, সেই আনন্দময় রমণ—ভগবানের সহিত ভক্তির রমণ—আকুলা রাধিকা একদা চিত্তময় চিত্রিত করিলেন—চিত্রিত করিয়া তন্ময়ী হইয়া গেলেন। তন্ময়ী রাধিকা যেন সেই ছবি বৃন্দাবনে প্রকাশিত দেখিলেন। কিন্তু, হায়, রাধিকার সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, সে ধ্যান ভঙ্গ হইল! কবে তিনি সেই নিত্য সুখে সুখিনী হইবেন, রাধিকা তজ্জন্য ব্যাকুলা। ক্ষণিকের স্বপ্ন সুখে রাধিকা সুখিনী নহেন। সেই রসসাগরের নিত্য সহবাস জন্য রাধিকা আবার ধ্যানমগ্না—প্রেমের প্রাচুর্য্যে পরিপূরিতা। প্রণয়াভিমানে যাঁহার দেহ পরিপূর্ণ, ভগবানের যিনি একান্ত আদরিণী, সেই প্রণয়াভিমানে—সেই আদরে কমলিনী মানিনী। ভক্তি, ভগবানের বড় আদরের জিনিষ। সেই আদরের রসময়ী কল্পনা—মান। ভক্ত, সরস্বতীর

কৃপায় কবি। মান, ভক্তির কবিত্ব—রসময়ের সহিত রসময়ীর লীলা—ভগবানের সহিত ভক্তির লীলা। প্রেমের সহিত প্রেম আকৃষ্ট হইবে বলিয়া রাধিকা মানিনী। ভক্তির চক্ষে মানের সৌন্দর্য্য। রাধিকা মানিনী—রাধিকারমণকে চিরদিন আপনার করিবার জন্য। প্রেমকে নিত্যানন্দময় করিবার জন্য রাধিকার মান। পলকের জন্যও সেই রসময়ের বিরহে রাধিকা কাতরা। কত কাতরা? শতবর্ষ বিরহে যেমন প্রেমিকের জন্য প্রণয়িনী কাতরা।

রাধাসুন্দরী।

জয়দেবের ভক্তি-কুসুম বসন্তকালের রাধাসুন্দরীতে প্রস্ফুটিত। বসন্তের উৎসাহে, উল্লাস ও মধুরতায় ভক্তিমতী রাধিকা প্রেমময়ী সুন্দরী। কবি, ভক্তিকে ঘনিষ্ঠতর প্রেমময়ী করিয়া সাজাইয়াছেন। সে রাধিকাকে দেখিলে মনে হয়, মধুরতা বসন্তে মিশ্রিত; বসন্ত, প্রেমে মিশ্রিত; প্রেম, সর্ব্বসুন্দরীর সৌন্দর্য্যে প্রস্ফুটিত, সর্ব্বসুন্দরী সর্ব্বসুন্দরের রমণে অনুরক্তা। বসন্তকালে সর্ব্বসুন্দরী প্রকৃতি-প্রেমে পরিপূরিতা হইয়া সর্ব্বসুন্দরের অঙ্কে, জয়দেব, শোভিতা দেখিয়াছেন। দেখিয়া প্রেমোল্লাসে গীতাবলির সুসংগীতে কীর্ত্তনের নৃত্যতালে মত্ত হইয়াছেন।

যিনি গোপীগণের প্রেম বুঝিতে পারেন, তিনিই বুঝিতে পারেন, সে প্রেম বসন্তকালের রমণীয়তায় সর্ব্বসুন্দরের মনোমোহন লীলায় কেমন দ্বিগুণতর উদ্দীপ্ত হয়! গোপবালাগণ কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা, সর্ব্বত্যাগিনী, ব্রজবাসিনী। কৃষ্ণপ্রেমে তাহাদের প্রাণ মন সমর্পিত। তাহারা কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত। বসন্ত-

কালের সৌন্দর্য্যে, প্রেমের উল্লাসে, মানের উৎফুল্লতায় গোপী-গণ কৃষ্ণলীলায় উন্মত্ত। সে উন্মত্ততা কেবল কবি-হৃদয়েই অনু-ভবনীয়; কবি-হৃদয়েই সেই উল্লাসের নৃত্য, সেই নৃত্য সুধা-সঙ্গীতে উৎসারিত।

প্রেমের পরিপুষ্টি-সাধনের বিশিষ্ট উপায় বিরহ। বঙ্গকবি-গণ এই জন্য বিরহে বড় উন্মত্ত। বিরহে ব্রজবাসিনীগণের ব্যাকুলতায় বঙ্গকবি কাঁদিতে ভালবাসেন। বঙ্গীয় বৈষ্ণব-কবিগণ সেই বিরহে কাতর;—কাতর রাধার এবং সখীগণের কাতরতায়। সেই ক্রন্দনে কাতর কবি রাম বসু। সেই ক্রন্দন-রবে কবি মধুসূদন তাঁহার বীণায় সুর দিয়া ব্রজাঙ্গনার দুঃখে বিগলিত হইয়া বঙ্গীয় বৈষ্ণব-কবির হৃদয়ে কাঁদিয়াছেন। বিরহে —কৃষ্ণবিরহে—ভক্তির মহা উদ্দীপনায় একদা বসন্ত-সৌন্দর্য্যের মধ্যে শ্যামসুন্দরের আবির্ভাব দেখিয়াছেন। বসন্ত-সমাগমে রাধিকা কৃষ্ণভক্তির উদ্দীপনায় বৃন্দাবনময় শ্যামাবির্ভাব অনুভব করিয়াছেন। বিরহিণীর স্বপ্নে—

"নাচিছে কদম্বমূলে, বাজায়ে মুরলী রে রাধিকারমণ"

এই তন্ময়তা, কবি অতি সুন্দর বর্ণে বসন্তানুরাগের সুকুমার তুলিকায় রাধার হৃদয়োচ্ছ্বাসে শ্যামাবির্ভাবের স্বপ্নরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। যে যে স্থলে রাধার এই তন্ময়-শ্যাম-স্বপ্নভাব, সেই সেই স্থল মধুর হইয়া গিয়াছে। কবি সেই মধুরতায় ভক্তির মধুর ভাব বিকাশ করিয়াছেন। মধুসূদন বঙ্গবাসিগণের কর্ণে মধুবর্ষণ করিয়াছেন।

বিরহ-কাতরা রাধিকা ও সহচরীগণ শ্যামানুরাগে এতই পরিপূর্ণ হইয়াছিলেন যে, সেই ভক্তির উদ্দীপনায় তাঁহারা

বৃন্দাবন শ্যামময় দেখিয়াছিলেন। বৃক্ষের পত্র-সঞ্চালনে শ্যামের নৃত্য শুনিতেন। বসন্ত-সমাগমে শ্যামের মধুরতায় বৃন্দাবন পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। বসন্তকাল যত মধুর, শ্যাম তাঁহাদের ততই মধুর ছিলেন। তাই, তাঁহারা বসন্ত-সমাগমে শ্যামাবির্ভাব অনুভব করিতেন। বকুলের মুকুল-প্রস্ফুটনে তাহার মূলে শ্যামরূপ স্বপ্নবৎ দেখিতেন। সমীরণের সুরবে শ্যামের বেণুরব শুনিতেন। বসন্তের সমস্ত মধুরতার সহিত তাঁহারা শ্যামকে একাত্ম করিয়াছিলেন। তাই বঙ্গকবি রমাপতি যখন গাইলেনঃ—

"সখি! শ্যাম না এল।
অলস অঙ্গ শিথিল কবরী, বিভাবরী বুঝি অমনি পোহা'ল।"—ইত্যাদি

তাহার উত্তরে রমাপতির কবিরমণী গোপাঙ্গনার মধুর ভক্তিতে গাইলেনঃ—

"সখি, শ্যাম আইল।
নিকুঞ্জ পূরিল মধুর ঝঙ্কারে, কোকিলের স্বরে গগন ছাইল।"—ইত্যাদি।

বঙ্গীয় কবিহৃদয়ের এই মধুরতা—ভক্তির মধুরতা—যে ভক্তি শ্যামকে বাসন্তী সৌন্দর্য্য ও মধুরতার সহিত অভেদ করিয়াছে—যে ভক্তি বসন্তকে শ্যামময় করিয়াছে। শ্যাম কি?—না, মাধুরী। বসন্ত কি?—না, শ্যামসুন্দর। বসন্তের মধুরতাই, শ্যামসুন্দর; আর শ্যামসুন্দরের মধুরতাই বসন্ত। তাই নিজে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, আমি—

"মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহং ঋতুনাং কুসুমাকরঃ।"

কুসুমাকরের সৌন্দর্য্য ও মধুরতাই শ্যামসুন্দর। শুধু বসন্ত কেন, যাহা কিছু সুন্দর, রমণীয়, মনোহর ও মধুর, তাহাই শ্যামসুন্দর। নবজলধর-বেশ, উজ্জ্বল নীলকান্তমণি-নিভা, ইন্দী-

বয়দলশোভা, অতসীকুসুম-শ্যামলতা, সুচিক্কণ কৃষ্ণকান্তি—এ সমস্তই শ্যামসুন্দরের রূপ। তাহাদের সেই সেই মনোহারিতা, কোমলতা, কান্তি ও মাধুরীই শ্যামসুন্দর। যাহা কিছু সুন্দর ও মধুর, তাহাই রাধিকার শ্যামস্বপ্ন উদিত করে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বাসন্তী মাধুরীই প্রধান শ্যামোদ্দীপনা। বাসন্তী-নিকুঞ্জে রাধিকা যান, শ্যামসুন্দরের মধুরতা সম্ভোগের জন্য। সেই মধুরতায়—নিকুঞ্জের পুষ্পময় সৌন্দর্য্যে—মনোহর বাসন্তী শোভায় —শ্যাম বনবিহারী। সেই নিকুঞ্জে গোপীগণ রাধিকা সঙ্গে—সাত্বিক সঙ্গীত আমোদ, চিত্র, শোভা, সৌন্দর্য্য, মঙ্গল, বাগ্‌বিন্যাস প্রভৃতি অষ্ট সহচরীগণ আনন্দময়ী হ্লাদিনীর সঙ্গে—অনুরাগ, প্রেম, সাধনা, আরাধনা, ধারণাদি ভক্তির সঙ্গে—শ্যামসুন্দরের মধুরতা সম্ভোগ করেন। সেই মধুরতায় তাঁহারা বিগলিত। মধুরতায় সমস্ত ভক্তিরস মাথামাথি। গোপীগণের সহিত রাধাশ্যামের এই নিকুঞ্জ-বিহার—ঈশ্বরের সহিত ভক্তির সহবাস—আরাধনার সহিত উপাস্য দেবতার রমণ। সেই রসপূর্ণ রমণের ছবি গীতগোবিন্দে। সেই রাধাশ্যামের সম্ভোগ-সুখে সমস্ত বাসন্তী প্রকৃতি সুখিনী। সেই সুখেই তাহাদের উল্লাস ও প্রেম-বিলাস। সমস্ত বাসন্তী দেশ রাধাশ্যামময়। তাই বসন্ত বুঝি লজ্জা পরিহার করিয়া সেই বিলাসে উন্মত্ত।

"বিগলিত লজ্জিত জগদবলোকন তরুণ করুণ কৃতহাসে।

বসন্তের প্রেম-বিলাসে সকলেরই লজ্জা একেবারে বিগলিত হইয়াছে। তরুণ, করুণ পাদপগুলি যেন তাহাই দেখিয়া পুষ্পচ্ছলে হাসিতেছে। হাসিতেছে ক্ষুদ্রশাখীর কিসলয় হইতে বৃহৎ অশ্বত্থ পর্য্যন্ত। সেই হাসির আনন্দে মিলিয়া বল্লরী নাচিতেছে, তরু-

শাখায় পত্রাবলী নাচিতেছে। মলয়, প্রেমানন্দে ধীরে ধীরে সুস্বরে প্রবাহিত হইতেছে। বসন্তবন আনন্দে গীত গাইতেছে—নিকুঞ্জে,—কুসুমকাননে—পিকের পঞ্চমস্বরে গীত গাইতেছে। এই মহান্ প্রেমলীলায় গহন কানন, আনন্দীগণ সকলই হাসিতেছে, সকলই নাচিতেছে, সকলই গাইতেছে, সকলই রাধাকৃষ্ণপ্রেমে মাতিয়াছে। এই আনন্দই প্রকৃতির মহা দেবদোল। এই আনন্দে সমস্ত বাসন্তী রাজ্য দোদুল্যমান। এই আনন্দে ভক্তের মানস-বৃন্দাবন প্রস্ফুটিত। সেই বৃন্দাবনের মধুময় নিকুঞ্জে ভক্তিময়ী রাধাসুন্দরী বিরাজিতা। বসন্তকাননে সরসীমাঝে কবি কমলদল-বাসিনীকে যেমন শোভিতা দেখিয়াছেন, রাধাসুন্দরী ভক্তহৃদয় তেমনই শোভিতা করিয়া আছেন। প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য্যে রাধিকা সুন্দরী। প্রকৃতিধামে সাত্বিকী ভক্তি অপেক্ষা সুন্দরী কে ? পৃথ্বীর সম্পদ যাঁর পদতলে, সেই জগল্ললামভূতা সমস্ত ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বরী হইয়া হীরক ভূষণে ভূষিতা ও মুক্তামালায় শোভিতা। কৃষ্ণপ্রেমের তন্ময়তায় তিনি নীলাম্বরা। পার্শ্বে রাধানাথ শ্রীকৃষ্ণ। যিনি অনন্তশয্যায় অনন্তচক্ষু উন্মীলন করিয়া পদতলে সেই নিত্য-আশ্রিতা ঐশ্বর্য্যময়ীর পানে চাহিয়া থাকেন, সেই প্রকৃতি-প্রেমমুগ্ধ রাধানাথ আজ রাধিকাপার্শ্বে সুশোভিত। বঙ্কিমদৃষ্টিতে সেই রাধাসুন্দরীকে তিনি নিয়ত দেখিতেছেন। ব্রহ্মাণ্ডকমল তাঁহার পদতলে। গলে প্রেমপুষ্পের বনমালা। করে বেদ গাথা শান্তির মোহন বাঁশরী। পীতাম্বরে বাসন্তী রাগ ও মাধুরী। রূপে প্রফুল্ল ইন্দীবরদলনিভা বা তমালের শ্যামলতা। *

---

* পাপ-বিনাশন হরি তমোরূপী। সেই হরিতে আত্মসমর্পণ করিয়া সাধক সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়েন। পক্ষান্তরে, আদিরস শ্যামবর্ণ, তাহার দেবতা বিষ্ণু; রসময় রসময়ীর রমণে শ্যামসুন্দর।

সত্যের বিজয়রূপ মোহনচূড়া শিরে শোভিত। মুখে আনন্দময়ের মৃদু মধুর হাস্য। চারিধারই হৃদ্‌বৃত্তিরূপা গোপাঙ্গনাগণ প্রেমের রাগ-রঞ্জনে রঞ্জিত করিতেছে। বাসন্তী-রাগে অনুরাগ সঞ্চারিত হইতেছে। বসন্ত সুরঞ্জিত হইতেছে। বসন্ত শ্যামময় ও রাধাময় হইয়া দেবদোল করিতেছে। সমস্ত বঙ্গদেশ সেই দোলে মাতিয়াছে। শুধু বঙ্গদেশ কেন, সমস্ত ভারতময় সেই দোলের আনন্দ-লহরী প্রবাহিত হইতেছে।

মধুমাসে।

সংসারিণী।

মধুমাসে মাধবীর ফুল ফুটিয়াছে। মাধবী সহকার-শিরে পল্লবিত বাহুলতা বিস্তার করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে চারিধারে সৌরভরাশি ছড়াইতেছে। বকুলশিরে গাছভরা মুকুল-মালাও প্রস্ফুটিত হইয়াছে। অশোক, চম্পক, পুন্নাগ প্রভৃতি বাসন্তী-কুসুমের সৌন্দর্য্য ও মধুগন্ধ চারিদিক শোভিত ও আমোদিত করিয়াছে। সেই গন্ধে বিভোর হইয়া মধুকর-নিকর উল্লাসে গুঞ্জরিয়া বেড়াইতেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে মাধবীলতায়, বকুলশিরে, অশোক-ফুলে আসিয়া বসিতেছে, উড়িতেছে, পড়িতেছে, মধুচক্রে যাইতেছে, আবার ফিরিয়া আসিতেছে।

বাসন্তী গৃহোপবনে নব-মালিকার কুসুমসৌন্দর্য্য বিকসিত। অগণ্য প্রফুল্ল ফুলরাজি শ্বেত শোভায় বন আলোকিত করিয়া প্রভাতের বিমল বিভার সৌন্দর্য্য বাড়াইয়াছে। মাঝে মাঝে গোলাপ-রূপবতী সেই সৌন্দর্য্যের রমণীয়তা ও বিচিত্রতা সম্পাদন করিতেছে। সেই কুসুমিত মধুকাননে, সুবাসিত গোলাপ বাগানে, প্রফুল্লিত মল্লিকাবনে, সুরকান্তি বিকসিত করিয়া এক বালিকাসুন্দরী পুষ্পচয়নে আসিয়াছেন। করপল্লব বাড়াইয়া কুমারী কত উল্লাসে ব্যস্ত হইয়া ফুল তুলিতেছেন! কুমারীর ওষ্ঠোপরি গজমতি। নব-বসনে দেহ আবরিত। কণ্ঠে সুবর্ণহার, কুমারীর হেমবালা-করে ফুলডালা। দেখিলে অনুমান হয়, পূর্ব্ব-

রাগরূপিণী দেবকন্যা উমা বুঝি হরমন তুষিবার জন্য উদয় হইয়াছেন।

গৃহাভ্যন্তরে আবার অন্যদৃশ্য। তথায় প্রফুল্লিতা পদ্মিনীর ন্যায় কমলারূপা গৃহিণী পূজার ব্রতে ব্রতী। নবস্নাতা, উজ্জ্বল পট্টবস্ত্র-পরিধানা, রূপলাবণ্যবতী পুণ্যকার্য্যের আয়োজনে গৃহ আলো করিয়া রহিয়াছেন। স্বর্ণালঙ্কারে তাঁহার দেহ ভূষিত। শিরে সিন্দূর, পায়ে অলক্তরাগ, গলে স্বর্ণহার, কর্ণে হীরক দুল। আলুলায়িত কুঞ্চিত কেশদাম পৃষ্ঠে পড়িয়াছে। চন্দ্রবদন কার্য্যে অবনত। গৃহিণী নিজ বিধবা কন্যাকে লইয়া নৈবেদ্য সাজাইতেছেন। কন্যার রূপে মাধুরী ও মলিনতা—মুখে শান্তি-ছায়া। পদ্মপার্শ্বে যেন অর্দ্ধনিমীলিতা, বিষাদিতা কুমুদিনী। দুজনে শুদ্ধাচারে, আস্তে আস্তে একমনে ও নীরবে কার্য্য করিতেছেন। শ্রদ্ধা যেন শুদ্ধিকে লইয়া দেবসেবার আয়োজন করিতেছেন। পবিত্র মনে, পবিত্র বসনে, সংসার ভুলিয়া সংসারিণী আজ মায়ার সঙ্গে জগৎ-সংসারিণীকে পূজা করিবেন। আর এ সমস্ত শোভা পরাজিত করিয়া পুরমধ্যে নিজে ভক্তিময়ী উদয় হইয়াছেন। ঋতুমাধব দেবদোলের পর আবার বুঝি মাধব ও মাধবীকে আনিয়াছেন। অথবা এই বাসন্তী সৌন্দর্য্যময় বঙ্গধামকে কৈলাস ভ্রমে হরপার্ব্বতী দেখা দিয়াছেন। যেখানে সৌন্দর্য্য, সেইখানে হিন্দুকল্পনা দেবসমাগম দেখে। হিন্দুর দেবপূজা শরতে ও বসন্তে, ফুলে ও চন্দনে। হিন্দুর দেবতা সৌন্দর্য্যে, প্রেমে ও দয়াতে পরিপূর্ণ। জগৎ সৌন্দর্য্যের প্রতিরূপ সেই সৌন্দর্য্য; জগৎ-প্রেম-পূর্ণতায় দেবতার চিরযৌবন; আর, ভক্তবাৎসল্যে সে যৌবনের মাধুরী। চিরযৌবনা ভক্তিময়ীর বক্ষঃদেশ জগৎ-

প্রেমে স্ফীত হইয়াছে। জগৎ-স্নেহরসে জগন্মাতার পয়োধর পরিপূর্ণ। শতকণ্ঠী সুলম্বিত মুক্তামালা সে প্রেমপূর্ণ হৃদয়কে সম্যক্ আবরিত করিতে পারে নাই। জগৎসংসারিণী ত্রিনয়নে ত্রিসংসার রক্ষা করিতেছেন। শক্তিরূপা প্রকৃতি-সুন্দরী আজ প্রকৃতির সমস্ত ঐশ্বর্য্যে ভূষিতা হইয়াছেন। তাঁহার গাত্রদেশে হেমকান্তি প্রতিফলিত হইতেছে। রুদ্রাদিরূপধারিণীর পদতলে ইন্দ্রাদির সাম্রাজ্য পদ্মরূপে বিকসিত হইয়াছে। বদনে কোটিচন্দ্র বিভাসিত। মস্তকে মণিময় মুকুট। হস্তে হীরক বলয় ও কেয়ূর। কর্ণে চন্দ্রার্ক সম কুণ্ডলদ্বয়। বালার্কবর্ণেশ্বরীর বসনে অগ্নিনিভ উজ্জলতা। সর্ব্বানন্দদায়িনীর বিম্বাধরে আনন্দের মৃদুমন্দ হাস্য। সর্ব্বসংসারিণীর দক্ষিণ করে রজত দর্বী, বামকরে সুবর্ণ পাত্র, সম্মুখে ভক্তিভিখারী হরি ভক্তি অন্ন ভিক্ষা করিতে আসিয়াছেন। এ সেই মানিনীর কাছে যোগিবেশে মানভিখারী। ভিখারীবেশে হরি আজ হররূপে উদয় হইয়াছেন। * তাঁহার পীতাম্বর বাঘাম্বর হইয়াছে। তাঁহার বেণু ত্রিশূলে পরিণত। বিষ্ণু নিজরূপে শ্বেত-বর্ণ। তাঁহার মৃণালমালা অহিবেষ্টনে গললগ্ন রহিয়াছে। কণ্ঠের কুবলয় মালায় তিনি নীলকণ্ঠ হইয়া গিয়াছেন। বঙ্কিমনেত্র ঢুলু ঢুলু করিতেছে। ভক্তিসুধাপানে হরি মৃত্যুঞ্জয়রূপে মোহনচূড়ার স্থানে ভুজঙ্গ-ফণা শিরে ধারণ করিয়াছেন। সেই উদাসীন সাজে পুরুষ আজি প্রকৃতির কাছে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছেন? কি

---

* ভক্তের নিকট হরি হর একই মূর্ত্তি। কৃষ্ণভক্ত নারদ মহাদেবেরও পরম ভক্ত ছিলেন। টীকাকার শ্রীমধুসূদন মহিম্ন স্তোত্রের কৃষ্ণপক্ষে অর্থ করিয়াছেন। মিথিলানিবাসী কবি কৃষ্ণদত্ত শিবপক্ষে সমস্ত গীতগোবিন্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ভিক্ষা করিতে আসিয়াছেন। অন্ন—ভক্তি। যে অন্ন জগতের সর্ব্বস্ব ও প্রাণ, সেই অন্ন সন্ন্যাসী জগন্ময় দিবেন বলিয়া অন্নময়ী * প্রকৃতির কাছে তাহা গ্রহণ করিতে আসিয়াছেন। যে ভক্তির জন্য জগৎ লালায়িত, সেই ভক্তি জগতে দিবেন বলিয়া হরি সন্ন্যাসী হইয়া ভক্তিপূর্ণার কাছে তাহা ভিক্ষা করিতে আসিয়াছেন। এ বড় সুন্দর দৃশ্য। জগৎ-প্রেমে মুগ্ধ হইয়া যখন জগতের অন্নভোগ জন্য জগৎপতি অন্নপূর্ণা প্রকৃতির অঙ্ক হইতে সেই অন্ন জগতে বিতরণ করিতেছেন, তখন সংসারিণী কেন না সে দৃশ্যে মোহিতা হইবেন, মোহিতা হইয়া সে রূপকে পূজা করিবেন।

সংসারিণী বড়ই ভক্তিভাবে, বড়ই নিকট-সম্বন্ধভাবে জগৎ-সংসারিণীকে পূজা করেন। তিনি নিজ ক্ষুদ্র সংসারে যেরূপ সংসারিণী, দেবী জগৎ-সংসারে সেইরূপ সর্ব্বসংসারিণী। তিনি ক্ষুদ্র সংসারের অন্নদাত্রী, দেবী জগৎ সংসারের অন্নপূর্ণামূর্ত্তি। তিনি যে হিন্দুসংসারের সংসারিণী, সে সংসার প্রেমের রাজ্য। সে সংসারে মানবপ্রকৃতির প্রমোদ ও নৃত্য। পরিবারমণ্ডলীর সকলে এক সঙ্গে প্রেমে, স্নেহে, মমতায়, মায়ায়, আদরে, যত্নে, সোহাগে, অভিমানে, ক্ষমায়, তিতিক্ষায়, সহিষ্ণুতায়, লজ্জায়,

---

* অন্ন—পর্য্যায়ে অন্ধ (প্রকৃতি)—ভক্ত।

অমরকোষ।

বেদে প্রকৃতির এক নাম অন্ন, যেহেতু, প্রকৃতিতে জীব ও ভৌতিক জগৎ পরস্পর অন্নসম্বন্ধে যুক্ত। জীবের অন্ন জীব ও উদ্ভিজ্জ, উদ্ভিজ্জের অন্ন ভৌতিক জগৎ ও জীব এবং জীব ও উদ্ভিজ্জ উভয়ই লয় প্রাপ্ত হইয়া ভৌতিক জগতকে পরিপোষণ ও রক্ষা করিতেছে।

পূজায়, সেবায় ও ভক্তিতে আবদ্ধ। সে সংসারে যৌবনোদ্দৃপ্ত লালসা ও রিপুকুল শাসিত থাকে—প্রেমের, আদরের, স্নেহের, মমতার ও ভক্তির শাসনে শাসিত। শাসন করে দারা-সুত, আত্মীয়-স্বজন ও গুরুজনেরা। যৌবন, সংসারভারে ও বন্ধনে শাসিত। যৌবনের শাসন যেমন, বার্দ্ধক্যের লীলা তেমনই। বৃদ্ধ, স্নেহ ও মমতায় আবদ্ধ হইয়া সুখে সংসারলীলায় জীবনের শেষাবস্থা অতিবাহিত করেন। হিন্দুসংসারে পুত্র পরিবার, আদরে ও যত্নে প্রবৃদ্ধ হয়। ইউরোপীয় সংসারে এ প্রেমরাজ্য নাই—সেখানে একান্নবর্ত্তী পরিবার-মণ্ডলী নাই। কেবল হিন্দু-কুলে ও ভারতে এই সামাজিক নিয়ম—এই হিন্দু ঋষিগণের উদার হৃদয়ের প্রেমসংসার-লীলার প্রতিষ্ঠা। হিন্দুসংসারে হৃদয়ের যত কোমল ভাব প্রস্ফুটিত হয়। সংসারকে হিন্দু কেবল বাড়াইতে চাহে। বাড়াইতে চাহে প্রতিবাসী, স্বজন, বন্ধুবান্ধব, কুটুম্বসাক্ষাৎ, পশুপক্ষী এবং অতিথি লইয়া। কেবল পরিবারমণ্ডলীতে সে প্রেম-আবদ্ধ থাকিতে পারে না—প্রেম দয়াতে, ক্ষমাতে প্রশস্ত হইয়া বাহিরে বিস্তারিত হয়। আমোদে, ভোজনে, অন্নসত্রে সংসারক্ষেত্র বিস্তৃত হয়। হিন্দু উদার প্রেমে মুক্ত হস্তে অতিথি-সেবায় নিরত হন। নিত্য অতিথিগণ তাঁহার সংসার-ক্ষেত্র বিস্তৃত করিয়া দেয়। এই সংসার-বিস্তৃতির নাম হিন্দুসংসার, মায়া ও প্রেমের রাজ্য, দয়ার উদ্বেলিত সাগর। দেখিও হিন্দু, ঋষির এমন সুন্দর প্রেম-সংসার-রচনা যেন ভাঙ্গিও না; এক্ষণকার দূষিত ইংরাজী শিক্ষার বিষক্রমিকে এ সংসারে প্রবেশ করিতে দিও না।

এই প্রেম-বিস্তৃত হিন্দুসংসারে সর্ব্বসংসারিণী অন্নপূর্ণা অধি-

ষ্ঠিতা আছেন বলিয়া গৃহীর নিজ আশ্রম এবং অন্যান্য আশ্রম-বাসীর অন্নসংস্থান হইতেছে। যখন সন্ন্যাসী সংসারীর কাছে অন্নভিখারী অতিথিরূপে উদয় হন, সংসারী তাঁহাকে হররূপে পূজা করেন। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, অতিথির বেদজ্ঞান গোত্র, আচরণ ও কুল কিছুই জিজ্ঞাসা করিবে না; বিষ্ণুরূপ ভাবিয়া তাঁহাকে পূজা করিবে। * হিন্দু জানেন, দেবতারা ভিখারী বেশে উদয় হন। দেবতারা দেখা দেন, তাঁহার প্রেম পরীক্ষার জন্য। যিনি দয়াধর্ম্ম ও প্রেমের উৎস উৎসারিত করিয়া দিতে আসেন, তিনি দেবতা নয় তো কি? হিন্দু দয়াতে কতদূর পরিপূর্ণ হইয়াছেন, তাহাই দেখিবার জন্য তাঁহার গৃহে অতিথির উদয়। সন্ন্যাসাশ্রমী সন্ন্যাসী সংসারীর অন্নে সেবিত হইয়া দেবকার্য্যে প্রাণ মন সমর্পিত করিয়া রাখিয়াছেন। গৃহী সন্ন্যাসাশ্রমের প্রতিপালক—প্রতিপালনের নিমিত্ত-কারণ মাত্র। নহিলে যিনি সর্ব্বপ্রতিপালনের বিধাতা, তিনিই সকলের প্রতি-পালক। গৃহী তাঁহারই রূপান্তর মাত্র। সংসারী সন্ন্যাসীর সৎকার করিয়া বিধাতারই কার্য্য করেন—দেবতার সৎকার করেন—দেবসেবার আয়োজন করিয়া দেন। সংসারী, বনবাসী তপস্বীকে বিত্তদান করিয়া দেবকার্য্যেরই সহায়তা করেন। এই সংসারা-শ্রমের গৃহিণী লক্ষ্মীরূপা সংসারিণী। সেই সংসারিণীর দেবত্ব অন্ন পূর্ণা-মূর্ত্তি।

---

* স্বাধ্যায়গোত্রচরণমপৃষ্ট্বা চ তথা কুলম্।
হিরণ্যগর্ভবুদ্ধ্যা তং মন্যেতাভ্যাগতং গৃহী।
বিষ্ণুপুরাণ। ৩ অংশ—১১ অধ্যায়।

অন্নপূর্ণা।

ভগবতী যে অংশে লক্ষ্মীরূপা, সেই অংশে তিনি অন্নপূর্ণা। ভগবৎ-শক্তি নারীরূপে সংসারধর্ম্মে গৃহীর অন্তঃপুরের অধীশ্বরী। হিন্দু গৃহিণী যেরূপে লক্ষ্মীরূপা, ব্যাস তাহা মহাভারত মধ্যে সুন্দর বিবৃত করিয়াছেন। হিন্দুগৃহী যত কেন ধনসম্পত্তির অধিপতি হউন না, তাঁহার গৃহিণীর কার্য্য কিরূপ হইবে, তাহা আমরা দ্রৌপদী-চরিত্রে পরিষ্কার বুঝিতে পারি। রাজান্তঃপুরে যাজ্ঞসেনী যে কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন, তাহা তিনি সত্যভামার নিকট একদা নিজেই বলিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন ;—"আমি প্রত্যহ উত্তমরূপে গৃহ-পরিষ্কার, গৃহোপকরণ-মার্জ্জন, পাক, যথাসময়ে ভোজন-প্রদান ও সাবধানে ধান্য রক্ষা করিয়া থাকি। আমি কাম, ক্রোধ ও অহঙ্কার পরিহার পূর্ব্বক সতত পাণ্ডবগণ ও তাঁহাদের অন্যান্য স্ত্রীদিগের পরিচর্য্যা করিয়া থাকি।" দ্রৌপদী এইরূপে গৃহস্বামিনী হইয়া পতিগণকে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছিলেন। লক্ষ্মীরূপা গৃহিণী পতিপরায়ণতার নিদর্শনস্বরূপ, গৃহকার্য্যের সমস্ত ভার লইয়া স্বামীরই সংসার-ধর্ম্মে সহায়তা করিয়া সহধর্ম্মিণী হয়েন। গৃহী, ধন মান ও সঞ্চয়ের জন্য সংসারে ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছেন; গৃহিণী অন্তঃপুরের সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে পর্য্যবেক্ষণ ও সমাধা করিয়া গৃহীকে দেবতারূপে সৎকার ও পরিতুষ্ট করিতেছেন। প্রাচীনাদিগের মধ্যে আমরা অনেক হিন্দুগৃহে এইরূপ হিন্দুগৃহিণী দেখিয়াছি। গৃহীর কার্য্যক্ষেত্র গৃহের বহির্দ্দেশে, গৃহিণীর রাজত্ব ও কার্য্যক্ষেত্র গৃহপুরীমধ্যে। মেধাতিথি ঋষিকুমারী অরুন্ধতীকে সাবিত্রীর স্থানে

রাখিয়া আসিয়াছিলেন। অরুন্ধতী সেই সাবিত্রীর চরিত্র দেখিয়া নিজ শিক্ষা সম্পাদন করিয়াছিলেন। সেই সাবিত্রীর মত সতী-চরিত্র সংগঠন করিয়াছিলেন, গৃহ-কার্য্যে সুদক্ষা হইয়াছিলেন, এবং তাঁহারই মত ভক্তিমতী হইয়া দেবারাধনায় কালাতিপাত করিতেন। *

গৃহিণীর রাজত্বে গৃহী বশীভূত, শাসিত এবং পরিতুষ্ট। সে শাসনে সুখ আছে, সে পূজাতে পর্য্যাপ্ত পরিতোষ। তত সুখ আর কোথাও নাই। তাই গৃহী যেখানে থাকুন না কেন, তাঁহার মন পড়িয়া রহিয়াছে, নিজ গৃহের সেই শান্তিময় নিকেতনে, যেখানে গৃহিণী তাঁহাকে প্রেমপূর্ণ বিশুদ্ধ অন্নবিতরণ করেন, আর অমৃতময় বাক্যে পূজা করেন। সেই পূজাতেই গৃহীর শাসন, বশুতা, প্রভুত্ব, পরিতোষ ও সুখ। গৌরীকান্ত সেইরূপ গৃহী, আর অন্নপূর্ণা সেইরূপ সংসারিণী। অন্নপূর্ণা দর্বী ও পাত্র করে গৃহিণীর দেবত্ব ও স্বধর্ম্ম কি, তাহাই সুস্পষ্ট প্রকাশ করিতেছেন। তিনি দেখাইতেছেন, যে সংসারের গৃহিণী নিজ হস্তে সমস্ত গৃহকার্য্য, অন্তঃপুর-পর্য্যবেক্ষণ ও দ্রৌপদীর ন্যায় অন্ন-ব্যঞ্জন পাক করেন, সেই সংসারেই লক্ষ্মী অবতীর্ণা হন, সেই সংসারেই সকলের তৃপ্তি;—ভোজনে, পানে, সর্ব্ববিষয়েই তৃপ্তি। হিন্দু-গৃহিণীর সমক্ষে অন্নপূর্ণার এই আদর্শ। এই আদর্শের দেবতা, দর্ব্বী ও পাত্রকরশালিনী, ঐশ্বর্য্যভূষিতা, লক্ষ্মীরূপা অন্নপূর্ণা।

মধুমাসে সমস্ত রবিশস্য গৃহাগত হইয়াছে। একালে আর তৃণ-ধান্য ক্ষেত্রে পতিত নাই, সমুদয় গৃহে আহৃত হইয়াছে, শুধু আহৃত

---

* কালিকাপুরাণে এই অরুন্ধতীচরিত্র বর্ণিত হইয়াছে।

নয়, ধান্যরাশি অন্নমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। সেই অন্নরাশি দেখিয়া গৃহিণী বড় আহ্লাদিতা, সেই অন্নরাশি হইতে একবার দেবতার জন্য কিছু না ব্যয় করিলে তাঁহার হৃদয় তৃপ্ত নহে। তাই তিনি অন্নকোট করিতে বাসনা করিয়াছেন। ভক্ত যেখানে অন্নকোট করেন, বিষ্ণুর সেখানে আবির্ভাব। বিষ্ণু অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে সেখানে অন্নের ভিখারী।* অন্নের ভিখারী নয়, ভক্তির ভিখারী। ব্রাহ্মণপত্নীগণের অন্নকোটে এজন্য আমরা হরির সহিত বৃন্দাবনের রাখালগণকে অন্নভিখারীরূপে দেখিতে পাই। তাহারা ত অন্নের জন্য আসেন নাই, মুনিপত্নীগণের ভক্তি-পূর্ণতা সমাধা করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। কৃষ্ণভক্তিতে ব্রাহ্মণীগণ আবদ্ধা থাকিবার পাত্রী নহেন, তাঁহারা ছুটিয়া গিয়া গোষ্ঠে গোপালগণের সহিত হরিকে অন্নদান করিয়া আসিয়া তবে যজ্ঞ সার্থক করিয়াছিলেন। সেইরূপ ভক্তিতে বুঝি আজ গৃহিণী অন্নপূর্ণার যজ্ঞে মাতিবেন। তাই এই মধুমাসে অন্নরাশির অধীশ্বরী হইয়া ভক্তি সহকারে দেবীকে পুরমধ্যে স্থাপিত করিয়াছেন। অন্নসত্র করিয়া গৃহলক্ষ্মী আজি জগৎলক্ষ্মী অন্নপূর্ণাকে পূজা করিবেন। সেই পূজার জন্য গৃহিণী নিবিষ্টচিত্তে আয়োজন করিতেছেন।

বিশ্বেশ্বরী।

অন্নপূর্ণামূর্ত্তিতে আমরা যে শুধু জগৎসংসারিণীকে দেখি এমত নহে, তিনি মহেশ্বরকে অন্নদান করিয়া বিশ্বাত্মাকে প্রীত ও

---

* ধাতা প্রজাপতিঃ শক্রো বহ্নির্বসুগণোঽর্য্যমা।
প্রবিশ্যাতিথিমেবৈতে ভুঞ্জতেঽন্নং নরেশ্বর॥

বিষ্ণুপুরাণ।—৩ অ; ১১।

পরিতুষ্ট করিতেছেন। হিন্দুর চক্ষে, বিশ্ব ও ব্রহ্ম একই। এক বিশ্বাত্মা ব্যতীত জগতে আর কিছুই নাই। বিশ্ব সেই পরমাত্মারই রূপ মাত্র। হিন্দু সেই জন্য পরমাত্মার পূজা করিয়া বিশ্বকে পূজা করেন। বিশ্ব ও পরমাত্মাকে যিনি অভেদ জ্ঞান করেন, তাঁহার বিশ্বপূজা পরমাত্মার পূজা মাত্র। তিনি বিশ্বময় কেবল পরমাত্মাকেই দেখিতে পান। এজন্য হিন্দু জানেন, পরমাত্মার পরিতোষ হইলেই জগৎ তুষ্ট; আর, জগৎকে তুষ্ট করিলেই পরমাত্মা পরিতুষ্ট। বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন :—

"নিখিল জীব, এই অন্ন, এবং আমি সকলই বিষ্ণুস্বরূপ; কারণ, বিষ্ণু ব্যতীত আর কিছুই নাই; এই জন্য সমুদয় ভূতসমূহ আমা হইতে ভিন্ন নহে। আমি সমুদয় জীবস্বরূপ; সুতরাং আমি সমুদয় প্রাণিবর্গের তৃপ্তির জন্য অন্ন প্রদান করিলাম।" *

হিন্দু এই ভাবে জগতের পূজা করেন। তাঁহার বিশ্বপ্রীতি ও বিষ্ণুভক্তি একই হইয়া পড়ে। যিনি প্রকৃত বিষ্ণুভক্ত, তিনি কখনই বিশ্বের প্রতি বিরাগী হইতে পারেন না। তিনি বিশ্বপ্রেমে পরিপূরিত হইয়া সেই প্রেমের পরাকাষ্ঠা বিষ্ণুভক্তিতে উপনীত হয়েন। যিনি বিষ্ণুকে পূজা করিতে গিয়া বিশ্বকে অবহেলা করেন, তিনি বিষ্ণুপূজা করেন না। বিষ্ণুর পূজা তখন সম্পূর্ণ হয়, যখন বিশ্ব পরিতুষ্ট হয়। যিনি বিশ্বপ্রেমে জগৎকে পরিতুষ্ট করেন, তিনিই যথার্থ বিষ্ণুভক্ত। এইরূপ বিষ্ণুভক্তি ব্যাস জলদক্ষরে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তিনি উপদেশ দিয়াছেন,

---

* ভূতানি সর্ব্বাণি তথান্নমেতদহঞ্চ বিষ্ণুর্ন যতোঽন্যদস্তি।
তস্মাদহম্ ভূতনিকায়ভূতমন্নং প্রযচ্ছামি ভবায় তেষাম্॥ ৫২॥

বিষ্ণুপুরাণ। ৩ অংশ। ১১ অধ্যায়।

বিশ্বাত্মাকে পূজা করিলে বিশ্ব পরিতৃপ্ত হয়, এবং বিশ্বকে পরিতুষ্ট করিলে বিশ্বাত্মা পূজিত হয়েন। অন্নপূর্ণা-প্রতিমায় আমরা দেখিতে পাই, দেবী হরকে অন্নদান করিতেছেন। সে অন্নদান কোথায় পর্য্যবসিত হইতেছে, তাহা এ প্রতিমায় চর্ম্ম-চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহা জ্ঞানচক্ষু ও ভক্তিতে প্রতীয়মান। ব্যাস তাহা আর এক স্থানে প্রকাশ করিয়া দেখাইয়াছেন। দুর্ব্বাসার পারণে তাহা স্পষ্টাভিধানে প্রকাশিত হইয়াছে। দ্রৌপদী যখন স্থালীসংলগ্ন অবশিষ্ট শাকান্ন লইয়া শ্রীকৃষ্ণকে দিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণ যখন তাহা আহার করিলেন, তখন সেই আহারে দুর্ব্বাসার দশ সহস্র শিষ্যের উদর পরিপূর্ণ হইল। ব্যাসের এই রূপক কথায় আমরা অন্নপূর্ণা-মূর্ত্তির সমুদয় রহস্য সুস্পষ্ট দেখিতে পাই। দেখিতে পাই, দুর্ব্বাসার পারণ অন্নপূর্ণা প্রতিমার অপরাংশ মাত্র। দেখিতে পাই, অন্নপূর্ণা হরকে অন্নদান করিয়া বিশ্বকে অন্নদান করিলেন। যে অন্ন বিশ্বরূপ ভব প্রাপ্ত হইয়া পরিতুষ্ট হইলেন, সেই অন্ন ভবসংসারে উপনীত হইল। বিশ্বেশ্বর মহাদেব জগৎস্বরূপ, আর বিশ্বেশ্বরী অন্নপূর্ণা দ্রৌপদী—বিষ্ণুভক্তিরূপা। অন্নসত্র করিয়া বিশ্বকে পরিতুষ্ট না করিলে কখন অন্নপূর্ণা-পূজা সম্পূর্ণ হয় না। তাই, ভক্ত অন্নপূর্ণা পূজা করিয়া অন্নসত্র করেন। অন্নসত্র না করিলে জগৎ পরিতুষ্ট হয় না। জগৎ-পরিতোষের প্রতিমাই অন্নপূর্ণা-মূর্ত্তি।

দয়াময়ী।

যে দান জগদ্ব্যাপ্ত, তাহাই দেবদয়ার বিকাশ। যাহা অনন্তভাবে পরিপূর্ণ, তাহাই দেবত্ব; দয়ার অনন্তপ্রসারে দয়ার

দেবত্ব। দেবদয়াতেই সংসার চলিতেছে। এই দেবদয়া জীবের জীবননিদান। জীব যাহা কিছু সম্ভোগ করে, প্রকৃতির যত কিছু বিভব ও সম্পত্তি, সমস্তই দেবদয়ার সামগ্রী। জগৎ দেব-দয়া-ময়। যেথানে দেবদয়া নাই, সেথানে পুরুষকার বিফল। মহা-ভারত কহেন :—

"পণ্ডিতেরা পুরুষকারকে ক্ষেত্র এবং দৈবকে বীজ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ক্ষেত্র ও বীজ এই উভয়ের একত্র সমাগম হইলেই ফল উৎপন্ন হয়।"

দেবদয়ারসে পৌরুষতরু মুঞ্জরিত হয়। সেই দেবদয়ার প্রতি-মূর্ত্তি অন্নপূর্ণা এবং পৌরুষের মূর্ত্তি ভিখারী হর। পুরুষ, প্রকৃতির সঙ্গে না মিলিলে বিশ্বসমুদ্ভূত হয় না। বৃন্দাবনবিলাসিনীর শক্তি-সঞ্চারে কৃষ্ণ গোবর্দ্ধনধারী—প্রজাবর্দ্ধন সংসারধারী। অনন্তদেব অনন্তনাগশক্তিতে পৃথিবী ধারণ করিয়া আছেন। মহাদেবের এক নাম এই জন্য "অনন্ত সর্পরূপী।" "সন্ন্যাসী" এই শক্তি-ভিখারী "ভিক্ষু।" * পুরুষকার দেবদয়ার কাঙ্গাল হইয়া বেড়াইলে তবে তাহা লাভ করিতে পারে।†

* মহাভারতীয় অনুশাসন-পর্ব্বে যাহা তণ্ডীকৃত স্তব বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে মহাদেবের সহস্র নাম ও গুণকীর্ত্তন হইয়াছে; যিনি জ্ঞানী, তিনি সে স্তব বুঝিতে পারেন। তিনি মহাদেবের সম্পূর্ণ মূর্ত্তি ও গুণ বুঝিতে পারেন। এক একটি নাম এক একটি দার্শনিক তত্ত্ব। আমাদের এই প্রস্তাবে মহাদেবের একদেশ মাত্র বিবৃত হইয়াছে। মহাদেব অথবা পরমপুরুষ "সহস্রমূর্দ্ধা," "শতজিহ্ব," "সহস্রবাহু," "সর্ব্বদেবময়" ও "সর্ব্বাঙ্গ।" অন্নপূর্ণা-মূর্ত্তির সহিত মহাদেবের যতটুকু সম্বন্ধ, এই প্রস্তাবে কেবল ততটুকু বিবৃত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

† "Knock and it will be opened to you"—Jesus.

যাঁহারা এ বিশ্বের উপকার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের দৃঢ়-ব্রত কেবল দেবদয়া-প্রভাবে কৃতকার্য্য হইয়াছে। দেবদয়া-প্রভাবে তাঁহাদের প্রবৃত্তি সংসারব্যাপিনী হইয়া পুরুষকারের মহাব্রতপালনে সুসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এরূপ প্রবৃত্তি কি সকলের হয়? অন্নপূর্ণার দয়া কোথা হইতে নিঃসৃত হইতেছে, কেহ বুঝিতে পারে না। না বুঝিতে পারিয়া ভাবে নিজেরই পুরুষকার ও সামর্থ্য। জীবের সামর্থ্য—দেবতার শক্তি ও দয়া। দার্শনিক চক্ষে যাহা দেবশক্তি, ভক্তির চক্ষে তাহা দেবদয়া। জীবে যে পুরুষ বর্ত্তমান, সেই পুরুষ দিয়া সে দয়ার সঞ্চার হয়। পুরুষ দিয়া যে দয়ার সঞ্চার হয়, তাহার কার্য্য না করিলে দেবদয়ার বৃদ্ধি হয় না। এজন্য হিন্দুসমাজে এত দয়ার কার্য্য প্রচলিত আছে। সেই সমস্ত দয়ার কার্য্য, দেবানুগ্রহলাভের শিক্ষামাত্র। হিন্দু সংসারে ও সমাজে এই দেবকৃপার বড়ই আদর। হিন্দুসংসার ও সমাজ তাই দয়াতে পরিপূর্ণ, দয়ার প্রধান শিক্ষাস্থল।

হিন্দুসংসারী দানধ্যানে এই দয়াই শিক্ষা করেন। তাঁহার লক্ষ্য দেবদয়া স্বরূপা অন্নপূর্ণা—যাঁহার দান সংসারব্যাপী। হিন্দু মুষ্টি-ভিক্ষা দানে যাহা আরম্ভ করেন, অন্নসত্রে তাহার আয়তন বৃদ্ধি করেন। ক্রমে হিন্দুর যেমন ঐশ্বর্য্য বাড়ে, তেমনি তাহার দান বাড়ে। হিন্দুর ঐশ্বর্য্য-কামনা দয়াধর্ম্ম-বিস্তারে পরিতৃপ্তি লাভ করে। হিন্দুর দয়া সর্ব্বসংসারে প্রসারিত হইতে চায় বলিয়া হিন্দু ঐশ্বর্য্যের কামনা করেন, এবং সেই ঐশ্বর্য্য লইয়া দয়াধর্ম্মে এত অকাতর ও মুক্তহস্ত হয়েন। এত অকাতর ও মুক্তহস্ত হইয়াও হিন্দু অন্নপূর্ণার সর্ব্বসংসারব্যাপিনী দয়াতে আর্দ্র

পারেন না। তাঁহার বিষ্ণুপূজার আকাঙ্ক্ষা কিছুতে পরিপূর্ণ হয় না। হিন্দুর বিষ্ণুপূজা কেবল দেবতাদেরই সম্ভবনীয়। তাই, ত্রিপুরারি হর বিষ্ণুপূজায় রত। যখন দিগম্বর অন্নপূর্ণার অন্ন লইয়া জগন্ময় ব্যাপ্ত করেন, এবং বিষ্ণুর দয়া সর্ব্বসংসারে বিস্তৃত করিয়া নৃত্য করেন, তখন তিনি বিষ্ণুপূজাতেই রত রহিয়াছেন। ব্রহ্মা সমস্ত সৃষ্টি-ব্যাপারে বিষ্ণুর দয়া বিস্তৃত করিয়া বিষ্ণু-পূজাতেই নিমগ্ন হন। সেই বিষ্ণুপূজা করিয়া মহেশ্বর সদাশিব-নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। বিষ্ণুপূজায় ব্রহ্মার সৃষ্টি শতসৌন্দর্য্যে কুসুমিত ও শতসুখসাগরে প্লাবিত হইয়াছে।

হিন্দুসমাজ এই জগৎবিসারিণী দয়ার প্রতিমা। হিন্দুসমাজ দয়াধর্ম্মের প্রধান কার্য্যক্ষেত্র। সামান্যাকারে প্রতি হিন্দুগৃহে যেমন প্রতিদিন অন্নযজ্ঞ হইতেছে, হিন্দুসমাজেও সেই মহাযজ্ঞ-ব্যাপার। ভারতবর্ষ প্রচুর অন্নময় ক্ষেত্র। শস্যপূর্ণ ভারত কখন অন্নের জন্য দীন নহে। তাহার একবৎসরের উৎপন্ন অন্ন দুই বৎসর চলিতে পারে। বঙ্গদেশের কৃষক পর্য্যন্ত দুই বেলা ভুক্ত হয়। আর কোন দেশের দীন দরিদ্রগণ দুই বেলা অন্নলাভ করে না। বঙ্গদেশের অন্ন বাহিরে পৃথিবীময় যাইতেছে, তবু সে দেশবাসিগণ অন্নের জন্য কাতর নহে। বঙ্গদেশের এত অন্ন বাহিরে যাইতেছে, তথাপি বঙ্গদেশ পূর্ণ রহিয়াছে। বঙ্গদেশের ক্ষেত্র সমুদয় স্বর্ণবর্ষণ করিতেছে—অন্নমূর্ত্তিতে সর্ব্বদাই হাস্যময় হইয়া রহিয়াছে। যত অন্ন বাহিরে যাইতেছে, আমরা ততোধিক অন্নলাভ করিতেছি। আজিও শত শত বিস্তৃত ভূমিখণ্ড অকৃষ্ট রহিয়াছে। অন্নের অভাব হইলেই আমরা মাতা ধরিত্রীর কাছে ভিখারী হই, জননী নিজ বক্ষঃদেশ, প্রেমপূর্ণ হৃদয়, এবং মাতৃ-

স্তন হইতে অমৃতস্বরূপ অন্ন বাহির করিয়া দেন। এক হস্ত কেন, শত হস্তে বাহির করিয়া দেন। আমরা খাই, বিলাই, ভিক্ষা দিই। সেই অন্নে পূজা করি, পার্ব্বণ করি, সংসার পালন করি, আবার সংসারের চারিধারে অন্নক্ষেত্র করি।

হিন্দুসমাজ এইরূপ অন্নদানময়। হিন্দুসমাজভুক্ত কেহ অভুক্ত থাকে না। যে অতি দীন, সেও ভিক্ষালব্ধ অন্নে অনায়াসে কালাতিপাত করে, এবং অন্য ভিখারীকেও ভিক্ষা দেয়। হিন্দু-সমাজে এত প্রচুর অন্নদান আছে বলিয়া হিন্দুধর্ম্ম সর্ব্বদা জীবিতমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। অনেকে এখানে অনায়াসে সংসার-বিরাগী হইয়া ঈশ্বর-পরায়ণ সন্ন্যাসী হইয়া পড়ে। অন্নের জন্য কাহারও ভাবনা নাই। তবে কেন লোক ভগবানের কার্য্যে বিরত হইবে—ভক্তি অতৃপ্ত থাকিবে? যখন উদরান্নের ভাবনা নাই, ভগবান্ নিজেই অন্নদাতা, তখন কেন তাঁহার ধ্যানে চির-দিন নিমগ্ন থাকি না,—এইরূপ ভাবিয়া সমাজের শত শত লোক সংসার-বিরাগী হইয়া ভগবানসেবায় কালাতিপাত করেন। বিরাগী হন কিসের বলে? হিন্দুসমাজের আতিথ্য-ধর্ম্মবলে। সেইরূপ বিরাগী ঈশ্বরপরায়ণ সহস্রলোক হিন্দুসমাজকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। তাঁহাদের পুণ্যবল, ইন্দ্রিয়সংযম ও ধর্ম্মাচার-প্রভাবে হিন্দুসমাজ ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ হইয়া রহিয়াছে। হিন্দু-সমাজ ধর্ম্মকে পালন করিতেছে, ধর্ম্ম হিন্দুসমাজকে পরিপুষ্ট করিতেছে। গৃহীর আতিথ্যধর্ম্মের এজন্য এত গৌরব। হিন্দু-সমাজের ধর্ম্মে অন্নপূর্ণা দেদীপ্যমান বিরাজিতা থাকিয়া সংসার পালন করিতেছেন। হিন্দুসমাজ মহাতীর্থধাম হইয়াছে।

যে হৃদয় দয়াতে প্রবৃদ্ধ হয়, সেই হৃদয়েই প্রেম সঞ্চারিত

হয়। প্রেমের উদ্রেকেই ভক্তির আগমন। ভক্তির উন্মেষে ভগবানের উপাসনা। ভগবানের উপাসনায় সমস্ত জগতে প্রেম বিস্তৃত হয়। এইজন্য হিন্দুসংসারে এত আতিথ্যধর্ম্মের অনুষ্ঠান। এই জন্য ব্যাস শুকদেবকে বলিয়াছিলেন ঃ—

"সত্যযুগে তপস্যা, ত্রেতাযুগে জ্ঞানোপার্জ্জন, দ্বাপরযুগে যজ্ঞ এবং কলিযুগে দানই পরমধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।" *

যখন জীবশরীরে কেবল পাপের প্রাদুর্ভাব, তখন তাহার জীবনে কলিযুগের উদয়। সেই কলিযুগে দানধর্ম্মের প্রবৃত্তি রাখিলে ক্রমে তাহাতে দ্বাপরের সঞ্চার সম্ভাবনা। দ্বাপরে যজ্ঞানুষ্ঠানের সাধনায় যে চৈতন্যোদয় হয়, সেই চৈতন্যোদয় হইলে লোক ত্রেতাযুগে তত্ত্বজ্ঞানার্জ্জনে ব্যস্ত থাকিবেন। জ্ঞানার্জ্জনের পর সত্যযুগে জীব তপস্যায় নিরত হইবে। মানবের জীবিতকালেই এই যুগধর্ম্মের আবির্ভাব ঘটে। সংসারাশ্রমে দান ও যজ্ঞ, বাণপ্রস্থে তত্ত্বজ্ঞানার্জ্জন এবং সন্ন্যাসে তপস্যা। দান ও যজ্ঞই, জ্ঞানার্জ্জন এবং তপস্যার সোপান-স্বরূপ। সেই দানধর্ম্ম ও যজ্ঞ এই জন্য গৃহীর অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। দানে হৃদয় প্রশস্ত হয়। সামান্য দান হইতে লোক ক্রমে ক্রমে বিশ্বপ্রেমে ও ঈশ্বর-ভক্তিতে উপনীত হইতে পারেন।

দানের ফল অপর্য্যাপ্ত। অন্নদানের ফল হাতে হাতে। দাতা গ্রহীতা উভয়েই দানে তৃপ্ত। এই তৃপ্তি অন্নদানে যত দূর, অন্য দানে তত দূর নহে। ক্ষুধার্ত্তকে পরিতৃপ্ত হইতে দেখিলে কাহার না সুখ? যে দান করিতেছে তাহার সুখ, যে দান গ্রহণ

---

* মহাভারত; শান্তিপর্ব্ব—২৩১ অধ্যায়।

করিতেছে, তাহার সুখ ও তৃপ্তি; যে খাওয়াইতেছে তাহার সুখ, আর যে দেখিতেছে, তাহারও সুখ। শুদ্ধ তাহাই নহে, যে সেই অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতেছে বা করিয়াছে, তাহারও সুখ। আর কোন দানে ভিখারীকে তৃপ্ত করা যায় না। এত আমোদ, এত সুখ আছে বলিয়া হিন্দুসমাজে আমরা অন্নসত্র সর্ব্বদাই দেখিতে পাই। আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাই, হিন্দু-সমাজের যেখানে সেখানে কেবল পানভোজনের আমোদ প্রমোদ চলিতেছে, সহস্র সহস্র কাঙ্গালী পাত পাতিয়া পর্য্যাপ্ত-পরিমাণে আহার পান করিতেছে। আর সেই অন্নসত্রের ঘোর কলরব ও আমোদের উৎসব পড়িয়া গিয়াছে। আমোদ সমস্ত পরিবারের; সমস্ত ক্ষুধার্ত্তের, সমস্ত পল্লীর এবং সমস্ত সমাজের। এই আমোদে অন্নপূর্ণার উদয়। সেখানে অন্নসত্র চলিতেছে, যেখানে কেবল পান, ভোজন ও দান, শত হস্তে পান ও দান, সেইখানেই যজ্ঞেশ্বরী অন্নপূর্ণা বিরাজিতা।

বঙ্গের প্রচুর অন্নক্ষেত্রে দয়ার প্রবৃত্তিস্রোত গঙ্গার ন্যায় বহিয়া যাইতেছে। এই দয়াস্রোতে দেশশুদ্ধ পরিতুষ্ট ও রসার্দ্র হইয়া আছে। দরিদ্রের কুটীরেও শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত হইতেছে। যে যেখানে আছে, সে সেই স্থান হইতে নিজ আহার্য্য সংগ্রহ করিতেছে। কাহাকেও অন্নের জন্য দেশ দেশান্তরে যাইতে হয় না। এ দেশে প্রতি ব্যক্তি দয়া দাক্ষিণ্যের আধার। সংসারীকে দয়াশীল কাজে কাজে হইতে হয়। এত ভিখারী, এত অতিথি, এত পূজা পার্ব্বণ, এত অন্নসত্রের কারখানা যে, দয়ার ব্যবহার না করিয়া কেহ সমাজে থাকিতে পারে না। এখানে প্রতি গৃহ অতিথিশালা, প্রতি গৃহস্থাশ্রম দেবমন্দির। অন্নদান সবাই

সবাইকে করিতেছে। হিন্দু রাজ-সংসারে শত শত সন্ন্যাসী প্রতি-দিন প্রতিপালিত হইতেছে। কত মধ্যবিত্ত লোক, কত নিরাশ্রয় কুটুম্ব সাক্ষাৎকে অনায়াসে প্রতিপালন করিতেছে। যাহা বঙ্গ-দেশে দেখিতে পাওয়া যায়, ভারতের অন্য সর্ব্বত্রও সেইরূপ দয়ার ব্যবহার ন্যূনাধিকরূপ বর্ত্তমান। হিন্দুসমাজস্থ জনগণ দয়া ও প্রেমে সম্বদ্ধ ও পরিবর্দ্ধিত। এ সমাজে প্রতি ব্যক্তি দয়ার ব্যবহারে বিশ্বপ্রেম বিস্তারিত করিতেছে। দয়া ও প্রেমে সমাজ ও দেশশুদ্ধ প্লাবিত।

ইউরোপীয় খ্রীষ্টীয়সমাজে কি এইরূপে দয়া ধর্ম্মের অনুশীলন হয়? সেখানে ভিখারীরা অন্যরূপে প্রতিপালিত। হিন্দুসমাজে দাতা দরিদ্রকে সাক্ষাৎ দান করেন। ইউরোপে দানের সেরূপ প্রণালী নাই। সেখানে চর্চ্চে, অতিথিশালায় ও অন্যান্য দাতব্য-মন্দিরে ভিন্ন দান মেলে না। সেখানে ভিখারীর প্রতি গৃহে যাইবার যো নাই। নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া তাহাদিগকে আতিথ্য গ্রহণ করিতে হয়। সেখানে ধনিগণ কেবল বড় বড় দাতব্যাগার নির্ম্মাণের জন্য এবং অতিথি-সৎকারের জন্য বড় বড় দান দিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদের অর্থে ও তাহার সুদে স্থানে স্থানে অতিথিসৎকার হয়। দাতার সহিত দানের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। প্রতি গ্রামে, প্রতি পল্লীতে প্রতি বাড়ীতে ভিক্ষা মেলে না, ভিক্ষুককে দেখিলে লোক বিরক্ত হয়। সুতরাং প্রতি লোকের দয়ানুশীলনের অবসর ঘটে না। সেখানে অন্ধ, কুব্জ, বিকলাঙ্গ জনগণের প্রতিপালন জন্য বিশেষ ও স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত আছে। রাস্তায় রাস্তায়, বাড়ীতে বাড়ীতে তাহাদের দেখিবার যো নাই। দেশ-দেশান্তর হইতে আসিয়া তাহারা এক স্থানে সমবেত হই-

য়াছে। সেইখানে না যাইলে তাহাদের গতি নাই। জনসমাজে সুতরাং দয়ার অনুশীলন অল্পই আছে। সমাজস্থ প্রতি লোকের প্রেম প্রসারিত হইতে পারে না। সে প্রেম কেবল পরিবার-মধ্যেই আবদ্ধ। পরিবারও অতি সঙ্কীর্ণ। নিতান্ত শিশুগণ ও স্ত্রীমাত্র লইয়া সংসারধর্ম্ম। আত্মীয় ও কুটুম্ব সাক্ষাৎ পরভাগ্যোপ-জীবী হইতে পারে না। আবার ইউরোপীয় জাতিগণ অত্যন্ত ব্যবসা-বাণিজ্যপ্রিয়। সেই জন্য, অনেক সময় অনেক লোককে পরিবার-মণ্ডলী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে হয়। পৈতৃক বিষয়-বিভব ও ধন-সম্পত্তি কেবল জ্যেষ্ঠ পুত্রই পাইয়া থাকে। এ জন্য পিতার অপরাপর সন্তানেরা এদেশীয় ত্যজ্য পুত্রের ন্যায় নিতান্ত নিজ-ভাগ্যোপজীবী। তজ্জন্য তাহারা নিঃস্ব। নিজ ভাগ্য পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাদিগকে সংসারক্ষেত্রে বিস্তর চেষ্টা করিতে হয়। এমনও দেখা যায়, জ্যেষ্ঠ পুত্র বিপুল সম্পত্তির স্বামী হইয়া গৃহে বসিয়া আছেন, তাঁহার সহোদরকে উদরান্নের জন্য দেশে দেশে কিম্বা জাহাজে জাহাজে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে হইতেছে। কোথায় তাহার গৃহ, কোথায় তাহার পুত্র পরিবার! যে দেশের সমাজ-গঠন এই প্রকার, সে দেশে কি দয়া, স্নেহ, প্রেম ও ভক্তির স্ফূর্ত্তি হইতে পারে? সংসার-আশ্রম পাতিবার যে দেশে এত ব্যাঘাত, সে দেশে কি অতিথিসেবা হইতে পারে? অতিথিসেবা করিবে কে? সে দেশের দায়ভাগ-দোষে ধন-বিভাগও নিতান্ত দুষ্ট। তজ্জন্য দারিদ্র্য-পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। কেহ অতুল সম্পত্তির অধি-কারী, কেহ একেবারে নিঃস্ব। সেখানে কৃষিকার্য্যের তেমন সুবিধা নাই যে, লোক চাষবাস করিয়া খাইবে। দাতব্যা-

গার ভিন্ন দান মেলে না; দাতব্যাগারের বিত্ত ও আয়োজন যথেষ্ট নহে। তাই সামান্য মজুরীর উপর লোকের নির্ভর। মজুরী তত জুটে না। অনেক কষ্টে লোককে দেশের বাহিরে যাইতে হয়। তাই আমরা ইউরোপীয়গণকে হা অন্ন যো অন্ন করিয়া পৃথবীময় ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখি। এই দেখুন, আনি বেসাণ্ট কলিকাতার টাউনহলে লণ্ডনের দারিদ্র্য কিরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন :—

"লণ্ডন সহরে এক অংশে দেখিবে, ঐশ্বর্য্যের লীলাভূমি; তথাকার ধন, ঐশ্বর্য্য-সুখ, বিলাস-বাহ্যাড়ম্বর দেখিলে চক্ষু ঝলসিয়া যাইবে। কিন্তু সেই লণ্ডন সহরের অপর অংশে দেখিবে, উলঙ্গ, অন্নকষ্ট, অনাহার, রোগ এবং অতি বীভৎস ব্যাপার। স্বার্থপরতা—পাশব স্বার্থপরতা এই পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাণ। দয়া, দাক্ষিণ্য, পরোপকার, পরহিতৈষিতা, পর-দুঃখানুভূতি, সভ্য ইউরোপীয় জগতে এ সব কিছুই দেখিতে পাই না।

"এই পৌষ মাসের গভীর শীত; পথে বরফ পড়িতেছে; কিন্তু এই দিনে অতি প্রত্যূষে একবার লণ্ডন সহরের ডকে গিয়া দুঃখের দৃশ্যটা দেখিয়া আইস। রাত্রি পাঁচটা; শীতে পথে বাহির হইবার যো নাই। কিন্তু সেখানে কি দেখিবে? দেখিবে, সহস্র সহস্র লোক বস্ত্রহীন, এই দারুণ শীত বুক পাতিয়া লইয়া সামান্য কাজ পাইবার জন্য সেখানে যাইয়া জড় হইতেছে। শীতে ভ্রূক্ষেপ নাই; হয় তো কয়দিন একটুকরা রুটিও জুটে নাই; শীর্ণ দেহে ক্ষীণ প্রাণ ধুক ধুক করিতেছে। আশা, আজ ডকে কাজ পাইবে; কাজ পাইলে দু পয়সা উপার্জ্জন

হইবে! তাহাতে এক টুকরা রুটি কিনিয়া সাত দিনের সঞ্চিত উদরজ্বালার নিবৃত্তি করিবে! কিন্তু কাজ কি সকলে পায়? কাজের জন্য মারামারি, কাটাকাটি করিয়াও অনেকের কাজ জুটে না। প্রত্যহ প্রায় পঁচিশ সহস্র লোক কাজ না পাইয়া হতাশপ্রাণে এই ডক হইতে ফিরিয়া আইসে। পেটের দায়ে একমুষ্টি অন্নের জন্য বিলাতী মহিলাগণ কেমন করিয়া আত্ম-বিক্রয় করে, সতীত্ব জলাঞ্জলি দেয়? পাশ্চাত্য সভ্যতার এই দুঃখের কাহিনী শ্রীমতী আনি-বেসাণ্ট তাঁহার বাক্‌পটুতায় অতি সুন্দররূপে বর্ণন করিয়াছেন।”

দারিদ্র্যের এ ভয়ঙ্কর ছবি এ দেশে দেখিতে পাওয়া যায় না। এ দেশের সকল দায়াদ সমবিত্তভোগী। যেখানে জ্যেষ্ঠাধি-কার আবশ্যক, সেখানে তাহা ছিল। জ্যেষ্ঠাধিকার ভারতের রাজনিয়ম মাত্র। যখন হিন্দু রাজা ছিল, তখন তাহা কেবল রাজবংশে প্রচলিত ছিল। এখন আর সে নিয়ম দেখা যায় না। এখন সকলেই সমান বিত্তভোগী। ভারতের সকলেই স্বদেশীয় ধনধান্যের অধিকারী। ধনধান্য এখানে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়; সুতরাং এদেশের লোককে অন্য কোথাও যাইতে হয় না। কৃষিজীবী দেশে ব্যবসা চলিতে পারে, কিন্তু বাণিজ্যের উন্নতি হয় না। ভারতীয় হিন্দুরা স্ব স্ব দেশে আবদ্ধ। স্ব স্ব দেশ মধ্যেই অপর্য্যাপ্ত অন্ন সংগ্রহ হইয়া থাকে। স্ব স্ব দেশ মধ্যে আদান-প্রদানে অন্নের বিভাগ হইয়া সকলেরই সংকুলান হয়। সামাজিক নিয়মে তাহা সংকুলান করিয়া দেয়। সেইরূপ সংকুলান করিবার জন্য এদেশে মুষ্টি-ভিক্ষার প্রথা প্রচলিত। এদেশে অতিথি-সৎকারের তাই এত গৌরব, আদান

প্রদানের এত প্রচলন, দয়া ধর্ম্মের এত আদর। প্রতি লোক দয়া-ধর্ম্মের অনুশীলন করিয়া, দয়া ও প্রেম প্রসারিত করিয়া সুখী হয়। কৃষিজীবী হিন্দু ভারতবাসিগণ পরিবার-মণ্ডলী-মধ্যে সুখে বাস করে। সেই পরিবার-মণ্ডলী-মধ্যে সকল ভক্তি-ভাজন, স্নেহাস্পদ ও প্রণয়পাত্র একত্র মিলিত। সেই পরিবার-মণ্ডলী কেমন প্রেমের লীলাক্ষেত্র, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। পুত্রকন্যা উৎপাদন করিয়া এখানে সংসার আশ্রম না করিলে মহাপাতক হয়। বিদেশীয় ম্লেচ্ছ ব্যবহার ও নির্দ্দয় নিয়মাবলি পাছে এই আশ্রমের সুখ ভঙ্গ করিয়া সর্ব্বনাশ ঘটায়, তাই ভারতে সিন্ধুপারে যাওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে। যে সংসারে দয়া নাই, প্রেম নাই, স্নেহ-মমতা ও ভক্তি নাই, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা ও তিতিক্ষা নাই, সে সংসারে কখন দেব-ভাবের স্ফূর্ত্তি হয় না। দেবভাবের স্ফূর্ত্তিতে দেবতার উদয়। দেবতারা উদিত হন—প্রেমের রাজ্যে ও দয়ার সংসারে। হিন্দু সংসার দেবসেবা-ক্ষেত্র, যাগযজ্ঞ ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে পরিপূর্ণ। হিন্দু সংসারে মানবের যত দেবভাবের উৎকর্ষ সাধন হয় বলিয়া দেবতারা সে সংসারে প্রসন্ন হইয়া লীলা করেন। হিন্দুর দেব-সংসার নিত্য যজ্ঞময়। যখন দয়া ও প্রেম উছলিয়া উঠে, তখন হিন্দু আবার বিরাট যজ্ঞে অন্নদান করেন। সেই বিরাট যজ্ঞই অন্নপূর্ণা ও শিবের যজ্ঞ। সেই যজ্ঞে যত দেবভাবের বিরাট বিকাশ হয়। সেই জন্য শিব ও সতী বিনা হিন্দুর যজ্ঞ নাই। এই যজ্ঞে সমস্ত দেবতারা আহূত ও সমাদৃত হন। শিবরহিত যজ্ঞ অসম্ভব, হাস্যকর ও অশিবময় ব্যাপার। সেই উপহাস্য ব্যাপার পৌরাণিক দক্ষযজ্ঞ; তাহাই হিন্দু সংসারের বিপর্য্যস্ত

স্থূলভাব। দক্ষযজ্ঞে দেবতারা আসিয়া দেখিলেন, সতী—দয়া ও প্রীতি—দক্ষ-পীড়নে দেহত্যাগিনী। দেবতারা অমনি পলাইয়া গেলেন। দক্ষযজ্ঞ বিনষ্ট হইল। দক্ষের এক অসম্ভব ছাগমস্তক হইল। যিনি অন্নপূর্ণা-মূর্ত্তি বুঝিতে পারেন, তিনিই দক্ষযজ্ঞের রহস্য বুঝিতে পারেন। তিনি আরও বুঝিতে পারেন যে, যে স্থানে অন্নপূর্ণা-সতীদেহের অংশপাত হইয়াছে, সেই সেই স্থান অন্নপূর্ণা ও মহেশ্বরের অধিষ্ঠান-ভূমি এবং অন্নক্ষেত্রময় তীর্থধাম হইয়া গিয়াছে।

গঙ্গা।

এইরূপ স্থান কাশী। হিন্দুর মনে সেই স্থানই বারাণসী, যে স্থানে বিশ্বনাথ ও বিশ্বেশ্বরী অন্নপূর্ণার বিকাশ। * যে বিশ্বপ্রেম-ময়ী বারাণসী ভক্তের মানসপটে অঙ্কিত, কাশী তাহার স্থূল অনুরূপ স্থান। মানসিক বারাণসীকে মূর্ত্তিমতী করিবার জন্য হিন্দু কাশীপুরী রচনা করিয়াছেন। তথায় অন্নপূর্ণা বিরাজিতা—পার্শ্বে বিশ্বাত্মা বিশ্বেশ্বর—আর এই বিশ্বের অনুরূপ অন্নক্ষেত্র কাশী। কাশীতে কেহ অভুক্ত থাকে না। কাশী কোথায় স্থাপিত? যথায় গঙ্গাধরের প্রতি গঙ্গা ফিরিয়া চাহিয়াছিলেন। পতিত-পাবনী সংসারতারিণী গঙ্গা জগদুদ্ধারের জন্য যখন সাগরাভি-মুখে আসিতেছিলেন, তখন গঙ্গা একবার যে স্থানে ফিরিয়া নিজ পতির পানে চাহিলেন, যে স্থানে গঙ্গার হৃদয়ে শিবশঙ্করের প্রেম একবার জাগিয়া উঠাতে উত্তরবাহিনী হইয়া গঙ্গা কৈলাসাভিমুখে স্রোত ফিরাইলেন, যে স্থানে এই দেবপ্রেমের

* বারাণসী—যে গঙ্গার উপর আছে ও পুনর্জন্ম বারণ করে। মোক্ষদা-পুরী বিশেষ। শিবপুরী।

বিকাশ হইল, সেই স্থান পবিত্র হইয়া গেল। কাশী সেই প্রেমে পবিত্র। যে বিশ্বপ্রেম গঙ্গাপ্রবাহে প্রবাহিত, সেই বিশ্বপ্রেমে গঙ্গা যে দেশে গিয়াছেন, সেই দেশ ফল-মূল শস্যে পরিপূর্ণ হইয়াছে—সে দেশ অন্নময় হইয়াছে, সে দেশ উদ্ধার হইয়া গিয়াছে। এই বিশ্বপ্রেমে প্রবাহিত বলিয়া হিন্দুর চক্ষে গঙ্গা পবিত্র—গঙ্গা দেবতা। গঙ্গা, মাতার অধিক স্নেহে শত শত দেশকে অন্নদান করিতেছেন। গঙ্গাস্নানকালে হিন্দু তাই মাতর্গঙ্গে বলিয়া গঙ্গাপ্রেমে নিমগ্ন ও পবিত্র হইয়া যান। অতি ভক্তিসহকারে হিন্দু গঙ্গাকে পূজা করেন। গঙ্গা যে স্থানে শিবপ্রেমে উচ্ছ্বসিতা হইয়াছিলেন, সেই গঙ্গাবেষ্টিত দেশ শিবময়—আর তিনি বিশ্বপ্রেমে যেরূপ অন্নময়ী, গঙ্গা সেই অন্নময়ী অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতে তথায় উদিতা। এই শিবপুরীতে গঙ্গা গঙ্গাধরকে বক্ষে ধারণ করিয়া আছেন। গঙ্গার দেবপ্রেমে পরিপূরিতা বারাণসী মোক্ষদাপুরী,—মহাশ্মশান—রুদ্রাবাস—তীর্থধাম। মৃত্যুঞ্জয়ের শিরোদেশে যে মুক্তিবারি রহিয়াছে, তাহাই জ্ঞানবাপীতে নির্ঝরিত হইয়া মনিকর্ণিকায় আসিয়া গঙ্গা-স্রোতে প্রবাহিত হইয়াছে। গঙ্গা অন্নপূর্ণার বিস্তীর্ণ মূর্ত্তি। কাশী ভক্তিময় তীর্থধাম—স্থূলরূপা ভক্তি।

আর অন্নদাতা শতক্রতু দেবপতি ইন্দ্র। নিদাঘের আতপতাপে পৃথ্বীতল যখন শুকাইয়া আইসে, যখন তৃণ-শস্য বারি বিনা নীরস ও শীর্ণ হইয়া পড়ে, যখন তৃষ্ণার্ত্ত উদ্ভিদ জগৎ মৃতপ্রায় হইয়া উঠে, যখন ভারতের কৃষীবল জলের জন্য কেবল আকাশের পানে তাকাইয়া থাকে, তখন দয়ার্দ্রচিত্ত দেবেন্দ্র মেঘমালা সাজাইয়া বারিবর্ষণ করিতে থাকেন। প্রতি বৃষ্টিধারা তখন

অন্নরূপে ভূতলে পতিত হইতে থাকে। তখন প্রকৃতি অন্নপূর্ণা-রূপে পৃথিবীকে রক্ষা করেন। ভারতময় পুরুষ তখন অন্নভিখারী,—প্রকৃতি-দেবী অন্নহরণ করিয়াই যেন পুরুষের সহিত প্রেম-লীলায় রত হইয়াছেন। বারিবর্ষণের সুধাধারায় জগতের ক্ষুধা নিবারণ করিতেছেন। এই মূর্ত্তিই প্রকৃতির অন্নপূর্ণা-মূর্ত্তি।

প্রেমময়ী।

অন্নপূর্ণা—প্রেমময়ের সহিত প্রেমময়ীর লীলা—হরণ ও পূরণের লীলা। জগন্ময়—ব্রহ্মাণ্ডময় এই হরণ ও পূরণের লীলা চলিতেছে। বিশ্বে কেবল সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়। স্থূল জগতের লয়—হরণ; স্থিতি—পূরণ এবং সৃষ্টি সেই পূরণ সাধন করে। সূক্ষ্ম সৃষ্টি-ব্যাপারেও একবার হরণ হইতেছে, আবার তাহার পূরণ হইতেছে। * স্থূল জগতে দেখিতে পাই, মৃত্যুর পর জন্ম, জন্মের পর দেহ-পালন, দেহ-পালনের পর আবার মৃত্যু ও নবকলেবর। জড়জগৎ চতুর্ব্বিধ স্থূলশরীরকে পালন করিতেছে,

* সৃষ্টি-ব্যাপারের হরণ পূরণ স্বতন্ত্র। সাংখ্য মতে প্রকৃতির রাগ ও বিরাগের (Attraction and Repulsion) যোগই সৃষ্টি বা পরিণামের কারণ। ভগবান্ যাস্ক বলেন, রাগ ও বিরাগ (দ্বেষ) সত্ত্ব বস্তুর উপরে যথাক্রমে রজঃ ও তমোগুণের কার্য্য। রজঃ গুণ অগ্নি, তমঃ সোম। রজঃ Energy তমঃ Inertia। তমোগুণে জগতের ব্যক্তাবস্থা, রজোগুণে অব্যক্তাবস্থা। সত্ত্ব যখন বহির্মুখীন, তখন স্থূল ব্যক্ত জগৎ প্রসব করিতেছে, যখন অন্তর্মুখীন তখন স্থূল, সূক্ষ্ম সত্ত্বে লীন হইতেছে। অন্তর্মুখীন রজঃ (মৃত্যু) সত্ত্বকে পূরণ করিতেছে, এবং বহির্মুখীন তমঃ সত্ত্বকে হরণ করিয়া স্থূল পরিণামে জগৎ প্রসব (জন্ম) করিতেছে। আমাদের স্থূল দৃষ্টিতে যাহা মৃত্যু, তাহা সত্ত্বের পূরণ, যাহা জন্ম তাহা হরণ। এই সৃষ্টি-ব্যাপারই পুং ও স্ত্রী শক্তি।

স্থূল শরীর ধ্বংস হইয়া আবার জড়ে আসিতেছে। উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজগৎ পরস্পরের পুষ্টিসাধন করিতেছে। এ জগৎ পরস্পর খাদ্য খাদকের সম্বন্ধে আবদ্ধ। একের লয়ে অন্যের পালন ও সৃষ্টি। শৈশবে সৃষ্টি, যৌবনে ও প্রৌঢ়ে পূরণ এবং বার্দ্ধক্যে লয়ের আধিক্য। দেহ-পালনেও প্রতিক্ষণে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়। যাহা মানব-দেহের নিয়ম, তাহা সর্ব্ব জীবের নিয়ম। সর্ব্ব-সংসারে প্রকৃতি সতত নবীন বেশে দেখা দিতেছেন। পরিবর্ত্তনই জগতের নিয়ম ও মঙ্গল। এই হরণ ও পূরণই সংসারের শিবময় ব্যাপার। হরণ না থাকিলে সংসারের পূরণ, ব্রহ্মার সৃষ্টি ও জগতের মঙ্গল-বিধান হইত না। কাল নিয়তই হরণ করিতেছে, এজন্য মহাদেবের এক নাম কাল। অভাব তাঁহার নিত্যধর্ম্ম, হরণ তাঁহার নিত্য কার্য্য। এজন্য কাল শ্মশানবাসী ভিখারী। যিনি সংসারবিষ হরণ করিয়া মৃত্যুঞ্জয়, সেই বিষপানে তিনি নীলকণ্ঠ, সেই বিষময় সর্প তাঁহার শিরোভূষণ। চন্দ্রচূড় জ্ঞান-চক্ষে ত্রিসংসার ও ত্রিকালজ্ঞ; যে জ্ঞান জীবের অতীত, সেই জ্ঞানে তিনি চন্দ্রচূড়। শিবনেত্রে তিনি সংসার রক্ষা এবং ভক্তের মঙ্গলবিধান করেন, আর তৃতীয় নয়নে বিশ্বনাথ ভক্তি ও শক্তিময়ী প্রকৃতি-সুন্দরী ভগবতীর পানে চাহিয়া আছেন। * যিনি ধ্বংসময়, সেই ধ্বংসাবশিষ্ট ভস্ম তাঁহার রূপ। কালের আদি অন্ত নাই, জন্ম মৃত্যু নাই, এজন্য শিব স্বয়ম্ভু। যিনি

---

* কোন কোন মতে মহাদেবের ত্রিনেত্র জ্ঞানদৃষ্টির ত্রিপথ—শব্দ, লিঙ্গ এবং অক্ষ। বেদাদি—শব্দ (সূর্য্য), ন্যায়দর্শনমতে অনুমানই লিঙ্গপরামর্শ (চন্দ্র), এবং ইন্দ্রিয়-গোচর জ্ঞান,—অক্ষ (অগ্নি)। শাণ্ডিল্য সূত্র ৯৯। ত্র্যম্বকের অর্থ ত্রি, তিন বেদ বা অ, উ, ম এবং অম্বক চক্ষু।

সকল বলের সংহারী, ত্রিশূল তাঁহার মহাদণ্ড। তাঁহার শিঙ্গা মহাকালের ডাক জগন্ময় ঘোষণা করে। আনন্দময় শিবদাতা, আবার সেই শিঙ্গা ও ডমরু বাজাইয়া নৃত্য করেন, তাঁহার সর্পও শিরে সেই বাদ্যে নৃত্য করে। সংসারে তিনি এইরূপে বর্ত্তমান। যদি কালকে মূর্ত্তিমান করিয়া দেখাইতে হয়, তবে কেবল হিন্দুই তাহাকে প্রকৃত মূর্ত্তিতে জাজ্বল্যমান দেখাইয়াছেন। দেখাইয়াছেন, পঞ্চমহাভূত তাঁহার পঞ্চমুখ; এই পঞ্চভূত লইয়া যাঁহার লীলা ও নৃত্য তিনি ভূতনাথ। * এই পঞ্চীকরণ প্রকৃতি তাঁহার লীলাক্ষেত্র। এই ভূতনাথের লীলায় প্রকৃতি নিজগুণে—ব্রহ্মার সৃষ্টি গুণে নব নব সাজে নিত্য সাজিতে-ছেন, নিত্য নব সৌন্দর্য্যে প্রস্ফুটিত হইতেছেন। প্রকৃতিসতী উমারূপে নব সৌন্দর্য্যে নবীভূত হইয়া উদয় হইতেছেন। সেই সর্ব্বসুন্দরী উমা হরমনোমোহিনী। ভূতনাথ প্রকৃতি-প্রেমে

---

* শৈবদর্শন মতে ঈশ্বরের কৃত্য পঞ্চবিধ।—সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, তিরো-ভাব এবং অনুগ্রহকরণ। এইরূপেই তিনি সর্ব্বকালেই উদিত ও স্বপ্রকাশ হইয়া আছেন। সঙ্গীত-শাস্ত্র মতে তাল হরগৌরীর নৃত্য হইতে উৎপন্ন। হর জগতের পুং শক্তি, গৌরী স্ত্রী শক্তি। পুং শক্তি আবির্ভাবাত্মক, স্ত্রী শক্তি তিরোভাবাত্মক। পুং শক্তি প্রসব বা ত্যাগ করে, স্ত্রী শক্তি গ্রহণ করে। অব্যক্ত অবস্থা হইতে পুং শক্তি প্রভাবে জগৎ ব্যক্তাবস্থায় আসিতেছে, এবং স্ত্রী শক্তি প্রভাবে ব্যক্তাবস্থা অব্যক্তাবস্থায় পুনঃ-গৃহীত হইতেছে। এই ক্রিয়া বা গতিই জগৎ-সংসার। জগৎ-সংসারে এই শক্তি কালক্রমে হইতেছে। যে ক্রিয়া কালক্রমে ঘটিতেছে, তাহাই তাল ও নৃত্য। পুং শক্তির নৃত্য তাণ্ডব এবং স্ত্রী শক্তির নৃত্য লাস্য। তাণ্ডব ও লাস্যের আদ্য অক্ষর মিলিত হইয়া তাল শব্দের উৎপত্তি। বিশ্বের প্রাকৃতিক ক্রিয়া সমস্তই তালে তালে ঘটে। "ছন্দোভ্য এব প্রথমমেতদ্বিশ্বং ব্যবর্ত্তত।"—ভর্ত্তৃহরি।

বিভোর। তিনি যেমন প্রকৃতি লইয়া লীলা করিতেছেন, প্রকৃতি আবার তেমনি তাঁহাকে লইয়া লীলা করিতেছেন। স্থূল প্রকৃতি পুরুষের এই লীলাময় শাস্ত্রই পুরাণ। হিন্দুকবির কল্পনা এই লীলাময় সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ। সাঙ্খ্য, যে জ্ঞানতত্ত্ব আহরণ করিয়াছে, ভক্তি তাহা লইয়া শতমূর্ত্তি-শোভায় হিন্দুসংসারকে শোভিত করিয়াছে। হিন্দু কখন জড়প্রকৃতির পূজা করে নাই—সেরূপ পূজা শ্রুতিতে মহাপাপ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। * হিন্দু, প্রকৃতিতে পুরুষের পূজা করেন। পুরুষ, প্রকৃতি অভিন্ন বলিয়া প্রকৃতি কর্ত্তৃত্বসমন্বিতা। সেই কর্ত্তৃত্বসমন্বিতা প্রকৃতিই উপাস্য। তাই হিন্দুর মন্দিরে যেখানে দেবী, সেইখানে মহেশ্বর। তাই হিন্দু অগ্রে শালগ্রাম পূজা করিয়া অন্য দেবতার পূজা করেন।

ভক্তি একদা প্রকৃতি-সুন্দরী প্রেমময়ীর লীলা রচনা করিলেন। পার্ব্বতীকে লইয়া হর সংসারী; হরকে লইয়া পার্ব্বতী সংসারিণী। দুইজনে এত প্রেম যে, লীলায় মাখামাখি। লীলায় মাখামাখি যেমন কৃষ্ণ-রাধা। কৃষ্ণরাধার বিরহ কাল্পনিক মাত্র; তিলেকের জন্য বিরহ—কবির বিরহকল্পনা। কবি বিরহ কল্পনা করেন, কেবল প্রেমকে বাড়াইবার জন্য; প্রেমকে নূতন করিয়া নবোজ্জ্বল বেশে দেখাইবার জন্য বিরহের কল্পনা না করিলে প্রেমলীলার সৌন্দর্য্য ফুটে না। রাধার সৌন্দর্য্য কৃষ্ণ-বিরহে। সেই সৌন্দর্য্য ফুটাইবার জন্য ভক্ত-কবির দেববিরহকল্পনা। নহিলে,

---

* অন্ধন্তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ॥ ১২॥
সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বাসম্ভূত্যামৃতমশ্নুতে॥ ১৪॥
ঈশোপনিষৎ।

বাস্তবিক দেববিরহ ঘটিতে পারে না। রাধা নিত্য হরিময়ী, হরি নিত্য-রাধাময়—তাই মথুরা ও দ্বারকা-লীলা সম্ভব। * রাধার শক্তিসঞ্চারে কৃষ্ণ লীলাময়। সতী নিত্য শিবময়ী। দুর্গার শিরে সদাশিব বর্ত্তমান। একদা ভক্তকবি শিবদুর্গার বিরহ-কল্পনা করিলেন। সেই বিরহে শিব দুর্গাহারা। শিব দুর্গাহারা বলিয়া অন্নহারা। কারণ, মহাপ্রকৃতিদেবীই জগতের অন্ন। ভিখারী অন্নহারা হইয়া পাগল—ঘুরিলেন সর্ব্বদেশে, সর্ব্বগৃহে। অন্নহারা শিব অন্নপূর্ণার জন্য যখন একান্ত লালায়িত, পথশ্রান্ত, ক্লান্ত, তখন আর দয়াবতী স্থির থাকিতে পারিলেন না। নিজ দয়াগুণে শিবকে দেখা দিলেন। দেখা দিলেন কিরূপে?—অন্নপূর্ণারূপে। দেখাইলেন, অন্নপূর্ণা যাঁহার ঘরে, সেই শিব কিসের জন্য ভিখারী? প্রকৃতি নিত্য অন্নপূর্ণা রূপে কালকে নিত্য অন্ন যোগাইতেছেন। অনন্তকাল ধরিয়া এই কার্য্য চলিতেছে, এজন্য অনন্তকালই—মহাকাল।

কবিহৃদয়ের এই বিরাট-বিকাশ। ভক্তি, কবিহৃদয়ে মিশিয়া যে সৌন্দর্য্যে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে, অন্নপূর্ণার বিবরণ সেই সুন্দর পৌরাণিক কল্পনা। এই সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি কবির একেবারে মিথ্যা কল্পনা নহে। বাস্তবিক ব্যাপারের সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতে গেলে যে রচনার আবশ্যকতা, তাহাই কল্পনার সৃষ্টি। বিশ্বলীলা অসত্য ব্যাপার নহে। তাহা ভগবানের নিত্যলীলা। সেই লীলার, কবিত্বময় স্থূল রূপ-রচনাই পৌরাণিক কল্পনা। প্রতি

---

* ভক্ত গোবিন্দ অধিকারী নিজ কৃষ্ণযাত্রার পালায় মাথুর লীলা-শেষে রাধাকৃষ্ণের মিলন করিয়া গিয়াছেন।

দেবরূপ, শক্তিলীলার বিকাশ মাত্র—অনন্তদেবের আংশিক বিকাশ। তেত্রিশ কোটি দেবতায় অনন্তদেবের লীলা-বিকাশ। শক্তি ও ভক্তি কিয়ৎ পরিমাণে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া কল্পনার সহিত মিশিয়া সেই লীলাকে নানা অলঙ্কারে মূর্ত্তিমতী করিয়া দেখায়। ভক্তি, কখন অসত্য ব্যাপারে মোহিতা নহেন। প্রকৃত জ্ঞান, ভক্তিরসে পরিপুষ্ট হইয়া কবি-হৃদয়ে কুসুমিত হয়। ভক্তি, কল্পনাসাহায্যে সত্যকে সুন্দর করিয়া দেখেন—এ বিশ্বপ্রকৃতিকে বাস্তবিক অন্নময়ীরূপে দেখেন। দেখেন, প্রকৃতিদেবী অন্নরূপা, আর পরম পুরুষ তাঁহার ভোক্তা। প্রকৃতি মায়া; মহেশ্বর মায়াময় পুরুষ। সেই মায়াবিশিষ্ট পরমপুরুষের মায়াময় অবয়ব দ্বারা অশেষ ভুবন ব্যাপ্ত রহিয়াছে। এই মায়াবশতঃ পরমেশ্বরের অবয়বাদি কল্পিত হইয়া থাকে। সেই মায়ার অবসান হইলেই কেবল চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই প্রতীত হয় না।

মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ। ৪র্থ অধ্যায়।

এই বিশ্ব, প্রকৃতি পুরুষের প্রেমলীলা।
সেই প্রেমলীলা দেখিয়া জীব মোহিত।
জীব সতত সেই প্রেম ও কৃপাপ্রার্থী।
তাই শঙ্করাচার্য্য স্তুতি করিলেন :—

অন্নপূর্ণে সদাপূর্ণে শঙ্করপ্রাণবল্লভে।
জ্ঞানবৈরাগ্যসিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি নমোঽস্তুতে॥

বিজ্ঞাপন।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু-প্রণীত গ্রন্থাবলি।

গ্রন্থ।	মূল্য।
১। কাব্যসুন্দরী (দ্বিতীয় সংস্করণ ত্বরায় প্রকাশিত হইবে)	১৲
২। সমাজচিন্তা (পরিবর্তিত হইয়া দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইবে)।	১৲
৩। সাহিত্যচিন্তা	১৲
৪। দেবসুন্দরী	৸০

গ্রন্থাবলি সম্বন্ধে সম্বাদপত্রের সম্পাদকগণের অভিমত।

"বাঙ্গলা ভাষায় এরূপ গ্রন্থ (কাব্যসুন্দরী) এই প্রথম হইল। আলোচ্য গ্রন্থে পূর্ণবাবু বঙ্কিম বাবুর সৃষ্টি-চাতুর্য্য দেখাইয়াছেন।" সাধারণী, ৭ই ভাদ্র, ১২৮৭।

"* * * যাঁহারা বঙ্কিম বাবুর উপন্যাস-গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, পূর্ণবাবুর কাব্যসুন্দরী না পড়িলে, তাঁহাদের অধ্যয়নবিষয়ে অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যাইবে।"—নববিভাকর, ৭ই ভাদ্র, ১২৮৭।

"পূর্ণবাবুর" সমাজচিন্তা চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। কিসে হিন্দু সমাজের বর্তমান দুরবস্থা ঘটিল, কি উপায়ে তাহার মোচন হইতে পারে, এই গ্রন্থে পূর্ণবাবু তাহার বিচার করিয়াছেন *

* * * তিনি যে স্বদেশানুরাগে উত্তেজিত হইয়া দেশের দুর-বস্থার প্রকৃত কারণ ও বিদেশীয় সমাজের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া তাহার মোচনের উপায় নির্ণয়ে চেষ্টা করিয়াছেন, অসার গ্রন্থাবলির মধ্যে একখানি সারবান্ গ্রন্থ আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ করি।" বঙ্গবাসী, ১৮ই আষাঢ়, ১২৮৯।

"পূর্ণ বাবু সাহিত্য-সংসারে সুপরিচিত। তাঁহার "কাব্য-সুন্দরী"ও "সমাজচিন্তা" বঙ্গ সাহিত্যের অলঙ্কার। এই "সাহিত্য-চিন্তা"ও তাহার অগ্রজাদ্বয়ের ন্যায় পূর্ণ বাবুর ভাবুকতা ও প্রবীণতা খ্যাপন করিতে সর্ব্বথা সমর্থ, পাঠকমাত্রেই তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। পূর্ণ বাবুর সারগ্রাহিণী বুদ্ধি, পাশ্চাত্য ও আর্য্যসাহিত্য-সাগরে নিমগ্ন হইয়া যে রত্ন আহরণ করিয়াছেন, বাঙ্গলা সাহিত্যসেবীর নয়নপথে তাহা কখনও পতিত হয় নাই। সাহিত্য অনেকেই পড়েন,—তাহার প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কয় জন পড়িতে জানেন? তিনি পাশ্চাত্য সাহিত্যের সহিত আর্য্য-সাহিত্যের তুলনা করিয়া, প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি যেরূপে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহাতে "সাহিত্য-চিন্তা" নামটি সার্থক হইয়াছে।—হিতবাদী ২৪ই মাঘ, ১৩০৩।

'SAHITYA-CHINTA.—By Babu Purna Chandra Bose. Purna Babu, the author of "Kábya-Sundari" is too well known in the department of Bengali literature to require an introduction at onr hands. The latest production from his able pen is the subject of our comment to-day.

In this book the author has made an attempt to draw a

comparison between Sanskrit and English literatures as the two great teachers of mankind. In doing so he has successfully brought to prominence a very great defect in the English literature which has never before been touched upon. The English literature is rich and majestic; it has been rendered a thousand times more beautiful and fascinating by the masterly touches of men like Dowden. Taine, Stafford and others; but, as the author rightly points out, it has signally failed to build up ideal virtuous characters. It has very successfully painted the dark side of human nature by the creation of Lady Macbeths, Othelos, lagos and others of a like nature; in fact, it seems that the whole of the energy and resourees of the western authors have been spent to bring these fiendish characters to perfection and as a natural consequence, the bright side of the human nature has been too much neglected. No doubt we too have Ravanas, Durjodhanas and others in the Aryan literature to represent the dark side of human nature, but we have as well Ram Chandras, Yudhisthiras, Bishmas, Sitas and Droupadis side by side with them to show the excellence of virtue by contrast, thus making them appear a thousand times more attractive. In this way the Sanskrit literature as a moral teacher and elevator of nations has its equal nowhere. Its great characteristic is always to place vice under the control of virtue, whereas the western literature has unconsciously painted vice in such fascinating colors as to give it an ascendancy over virtue.

There is too great a tendency among our university-men to pay undue homage to western literature at the expense of our own; but this to a larger extent is attributable to imperfect knowledge of Aryan literature than to any unreasonable bias Those, that hold such a one-sided view in the matter will do well to spend a few hours on Babu P. C. Bose's "Sahitya chinta" The book has depicted with great force and precision the beauty and grandeur of Sanskrit literature and the touching language in which the noble traits in the character of our heroes have been described can not fail to excite admiration and sympathy even in most indifferent anglicised readers. We recommend the book to our readers as an instructive and entertaining study."—

Amrita Bazar. Patrika—18, December, 1896.

"*Sahitya-Chinta*, by the well known Bengali writer Babu Purna Chandra Bose, is a collection of literary essays in Bengali published in various magazines from the pen of the author. The essays show in a remarkable degree the author's grasp of the subjects dealt with, and we have no hesitation in pronouncing the book to be on the whole a high class publication."

Hope—18, March, 1897.

"পূর্ণবাবু লব্ধপ্রতিষ্ঠ, চিন্তাশীল লেখক। তিনি আজি কালি যাহা লিখেন, হিন্দুভাবে বিভোর হইয়া লিখিয়া থাকেন। পূর্ণবাবু ভাবুক, রসজ্ঞ এবং প্রেমিক। তাঁহার লেখায় মমত্বভাব আছে, কেন না তিনি ইংরেজিনবীশ হইয়াও ইংরেজি চক্ষে

কিছু দেখেন না। এই এমন "সাহিত্যচিন্তা" পুস্তকে পূর্ণবাবুর সকল গুণ একাধারে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। এমন তীব্র অথচ মধুর, ভাবগর্ভ অথচ রসাল—সাহিত্যালোচনা, অধুনা আমরা প্রায় দেখিতে পাই না। আমাদের সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, এখন আমাদের মধ্যে অনেক যুবক সাহিত্যসেবী হইতেছেন। আমাদের বিশেষ অনুরোধ, তাঁহারা যেন একবার এই পুস্তকখানি পাঠ করেন এবং পুস্তকগত উপদেশ অনুসারে লেখনী সংযত করিতে শিখেন। ভরসা আছে, তাহা হইলে যে সকল বিকটতা, উদ্ভটতা, রুচিপ্রমাদ-দোষ আধুনিক লেখকগণের লেখায় দেখা যায়, তাহা বিশেষ সংযমিত হইবে। কারণ, এখন আমরা যে দুই পাত ইংরেজি পড়িয়াই গ্রন্থকার হইবার উচ্চাশার পোষণ করিয়া থাকি। সাহিত্যদর্পণ বা কাব্যপ্রকাশ, কি কাব্যাদর্শের খোঁজ রাখি না, ইংরাজি রেটরিক পড়ি না, অথচ গ্রন্থকার হইয়া উঠি। সুতরাং আমাদের অনেকেই উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল, স্বেচ্ছাচার লেখক। সমাজ দেখি না, ধর্ম্ম বুঝি না, খোস খেয়ালে যাহা উঠে, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া বাহাদুরী লইবার চেষ্টা করি। আশীর্ব্বাদ করি, পূর্ণ বাবু চিরজীবী হউন, আর এমনি সু-চিন্তিত, সুসম্বদ্ধ পুস্তক লিখিয়া ও প্রচার করিয়া দেশীয় সাহিত্যের পুষ্টি করুন।"—বঙ্গবাসী—১২ই পৌষ, ১৩০৩।